শিবরাম চক্রবর্তীর
শিশুনাট্য
ওরিয়েন্ট
বুক কোম্পানি

॥✲॥ সূচীপত্র ॥✲॥

বিষয়	পৃষ্ঠা

শিবরাম চক্রবর্তী

শুধু লেখার ক্ষেত্রেই নয়, বচনে, আচরণে, প্রকৃতিতে সব দিক দিয়েই শিবরাম চক্রবর্তী বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখেন। একদিকে হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা অন্যদিকে মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালবাসার সমন্বয় তাঁকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে শ্রদ্ধার আসনে।

স্বর্গত শিবপ্রসাদ চক্রবর্তীর এই সর্বজনপ্রিয় অজাতশত্রু পুত্রটির জন্ম ১৩১০ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে (ডিসেম্বর, ১৯০৩)। আদি নিবাস চাঁচড় (মালদহ) কিন্তু শিবরাম চক্রবর্তীর জন্ম কলিকাতায়। স্মরণীয় সাহিত্যরথী স্বর্গতঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিবরামবাবুর আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত গ্রন্থাবলীগুলি বালক শিবরামের মনের রুদ্ধ অর্গলগুলি এক এক করে উন্মুক্ত করে দেয়। তাঁর মনকে নানাভাবে আলোকিত করতে থাকে। শিবরামের সাহিত্য-জীবনে সে প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

সারা বাঙলার শহরে-শহরে গ্রামে-গ্রামে যখন অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ উঠল শিবরাম তখন স্কুলের ছাত্র। সেই

অন্দোলনের অমোঘ আকর্ষণে তিনি সাড়া দিলেন, পরিণামে কারাবরণ করতে হ'ল।

কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের 'আত্মশক্তি'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন শিবরাম। 'আত্মশক্তি'কে কেন্দ্র করে পুনরায় তাঁকে যেতে হ'ল কারাগারে।

এই সময়ে কাজী নজরুল প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়।

তারপর তিনি সাহিত্যসেবায় নিজেকে পুরোপুরি ভাবে নিয়োজিত করলেন। সে সাধনা তাঁর আজও অব্যাহত।

কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন—'মৌচাক পুরস্কার' ও 'ভুবনেশ্বরী পদক' লাভ করেছেন। তাঁর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' কাহিনী চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে।

যে বসুমতী প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাবলীসমূহ তাঁর জীবনে একদিন সাহিত্যের কল্পনা জাগিয়েছিল, উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তাঁর জীবন-প্রকাশের পথ—সেই প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর গ্রন্থাবলীও প্রকাশিত হয়েছে।

শিশু-সাহিত্যিক ও হাস্যরসের স্রষ্টা হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত হলেও উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ ও কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'ভারতী'তে। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'মৌচাক'-এ।

এতাবৎ অসংখ্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' 'যখন তারা কথা বলবে', 'স্বামী মানেই আসামী','স্ত্রী মানেই ইস্ত্রি', 'হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন', 'বিরাট ভোগ', 'ভূতুড়ে অদ্ভুতুরে', 'বর্মার মামা', 'হান্স্-হানা', 'পোয়ারার স্বর্গ', 'অথ বিবাহ ঘটিত', 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'কিশোর সঙ্কলন', প্রভৃতি বহু গ্রন্থের নামই এক নিঃশ্বাসে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের এক নতুন ধারার প্রবর্তনে

শিবরামের গৌরব অনস্বীকার্য। বর্তমান শতকের বাংলা হাস্যরস সাহিত্যের এক নবদিগন্তের তিনি স্রষ্টা।

মানুষ শিবরামের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় বিদ্যমান তাঁদের অজানা নয় যে মানুষের ভাল হোক, কল্যাণ হোক—এই তাঁর জীবন-দর্শনের মূলমন্ত্র। তাঁর দরদী হৃদয়ের এই ঔদার্য সামগ্রিকভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল ও অনন্যসাধারণ করেছে।

শুধু গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতাই নয়, ছোটদের হাসির নাটক লেখায় তিনি অদ্বিতীয়। সে সব নাটক শুধু ছোটদের কেন বড়দেরও হাসিয়ে তুলবে,—সে হাসি নিষ্কলুষ ঝর্ণাধারার মত সহজ সাচ্ছন্দ্যময়। তাঁর সব কয়টি হাসির নাটক আমরা এই গ্রন্থে সংকলন করলাম।

পণ্ডিত-বিদায়
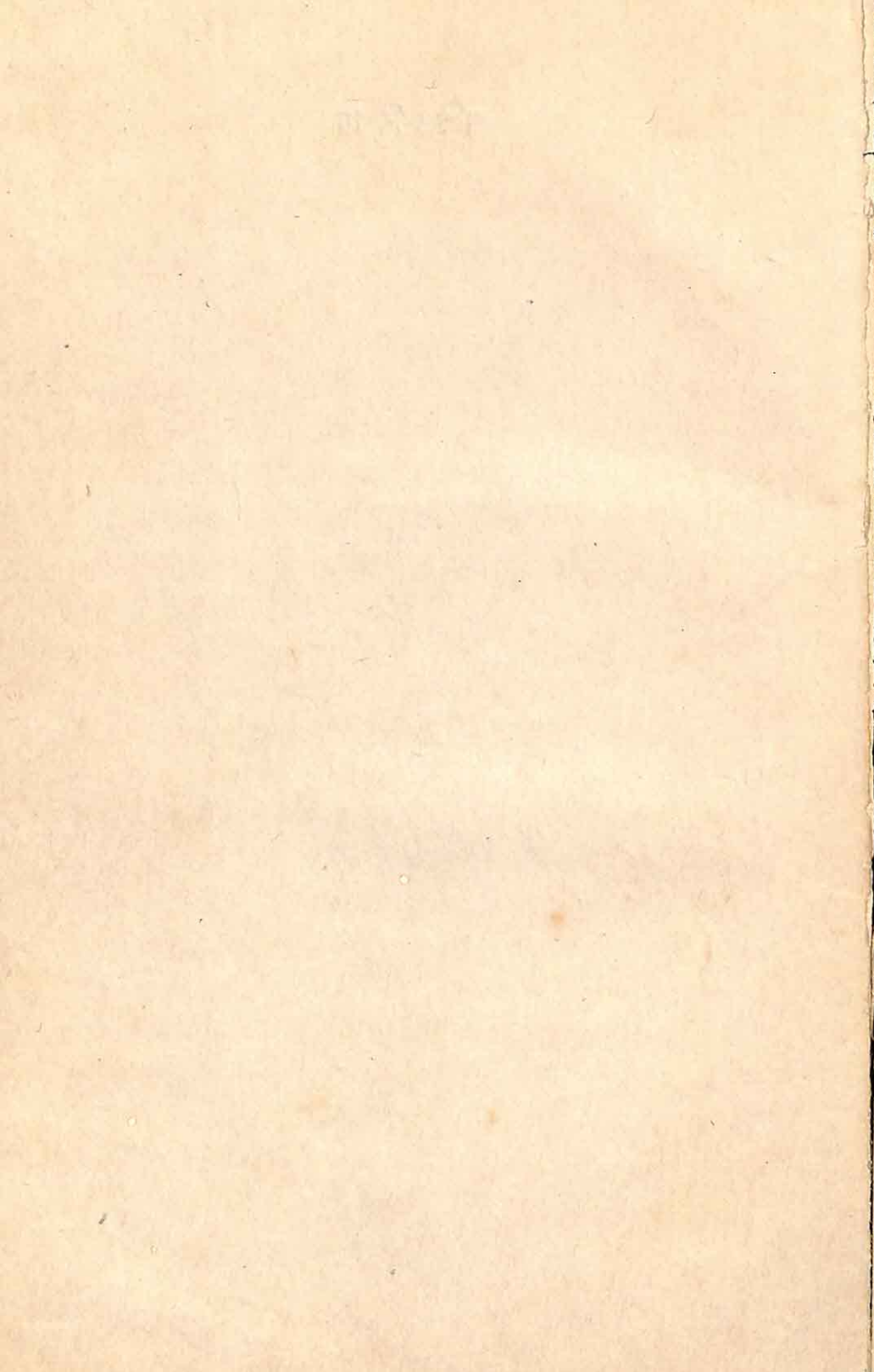
পণ্ডিত-বিদায়

প্রস্তাবনা

ইস্কুলের ক্লাসঘর। পদ্মলোচন, মিহির, সলিল, মৃগেন,
সরোজ এবং অন্যান্য সব ছাত্র মিলিয়া
জটলা করিতেছে।

পদ্মলোচন। কখন ঘণ্টা পড়ে গেছে, কিন্তু এখনো পণ্ডিত-মশায়ের পাত্তা নেই।

সলিল। ওঁর আর কি, ওঁর তো ঘণ্টা!

মিহির। কেলাসে এসেই বা করবেন কি? সেই তো ঘুম মারবেন এসে।

সরোজ। হ্যাঁ, অর্ধেক দিন ঘুম মারবেন আর অর্ধেক দিন আমাদের ধরে ধরে মারবেন।

মৃগেন। মারবেনই তো। অনেকদিনের হাতযশ—সে কি খোয়ানো যায়? এত করেও যদি তোরা সংস্কৃত না শিখিস্ সে তোদের বরাত!

[পণ্ডিতমশায়ের প্রবেশ]

পণ্ডিতমশাই। ভারী কলরব তুলেছে দেখ্‌চি। গলাটা তো ঠিকই নিয়ে এসেচ, ফেলে আস্‌তে পারো নি তো, কিন্তু আর দুটো করে' পা কোথায় পরিত্যাগ করে এলে বাপুরা?

পদ্মলোচন। আরো দুটো করে' পা? আজ্ঞে, কি বল্‌চেন পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিতমশাই। বৎস ধূম্রলোচন,—শ্রীবিষ্ণু—বাবা পদ্মলোচন, তোমাদের এই পদস্খলনের কথা ভাব্‌লে আমার দুঃখ হয়। মাঠই হচ্চে তোমাদের উপযুক্ত স্থান!

মিহির। মাঠ ?

পণ্ডিতমশাই। হ্যাঁ, মাঠ। তোমাদের পড়াতেই যদি আমার জীবন গেল তাহলে রাখালী করা আর কি দোষের ছিল ?

[চেয়ারে ভালো করিয়া জাঁকিয়া বসিয়া নাকে এক টিপ্ নস্য দিয়া]

হ্যাঁ, তার পর, তোমাদের আজ কি পড়াতে যাচ্ছি, বৎসগন নিশ্চয়ই তোমরা তা জানো ?

ছেলেরা। না পণ্ডিতমশাই, আমরা জানি না।

পণ্ডিত। তোমরা যখন জানোই না, তখন তোমাদের বলার আমার কিছু নেই।

[এই বলিয়া পণ্ডিতমশাই নাকে এক টিপ্ নস্য গুঁজিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন, ভুরুর ভুরুর করিয়া তাঁহার নাক ডাকিতে লাগিলেন]

পদ্ম। পণ্ডিতমশায়ের অনুস্বর শুন্‌ছিস্ ?

মৃগেন। কই না তো !

পদ্ম। ওই যে ওঁর নাকের ভেতর দিয়ে বেরুচ্ছে রে ! [নাক ডাকিয়া দেখাইল] হাজার হোক, পণ্ডিত মানুষ তো, ঘুমালেও পাণ্ডিত্য যায় না।

মিহির। কি রকম সংস্কৃত ঘুম একখানা !

সলিল। ঘুম কিরে নিদ্রা বল্ !

পদ্ম। এই নিদ্রা যেদিন চিরনিদ্রায় গিয়ে মিশবে সেইদিনই কেবল পণ্ডিতমশায়ের এই অনুস্বর লোপ পাবে।

সরোজ। সেদিন তো তাঁর বিসর্গ-প্রাপ্তি !

পণ্ডিত। [ঘুমের চট্‌কা ভাঙিতেই] য়্যাঁ—য়্যাঁ—কি বল্‌ছ ? বিসর্গ-সন্ধির কথা বল্‌ছ নাকি ? য়্যাঁ ?

সরোজ। আজ্ঞে না—

পণ্ডিত। হ্যাঁ, তোমাদের কী পড়াচ্ছিলাম? কী পাঠ দিচ্ছিলাম? য়্যাঁ?

পদ্ম। আজ্ঞে, অনুস্বর-প্রকরণ।

পণ্ডিত। অনুস্বর-প্রকরণ? অনুস্বর-প্রকরণ বলে' তো উপক্রমণিকায় কিছু নেই। পাণিনিতেও নেই—য়্যাঁ—অনুস্বর—অনুস্—

[পুনরায় নাক ডাকাইতে লাগিলেন]

পদ্ম। পাণিনিতে নেই, কিন্তু পণ্ডিতিতে আছে।

সরোজ। এই, কেন পণ্ডিতমশায়ের ঘুম ভাঙাচ্ছিস্ বলত? ঘুমিয়ে আছেন বেশ আছেন—জেগে উঠে পড়া চেয়ে বসলেই তো সর্বনাশ, কেউ আর তখন আস্ত থাক্‌ব না, মার খেয়ে খেয়ে মর্‌তে হবে সবাইকে।

সলিল। পদার পিঠ চুল্‌কোচ্ছে বোধ হয়।

সরোজ। পদা আছিস্, বেশ আছিস্ বাপু, আর যাই হোক বিপদা হোস্‌নে!

পণ্ডিত। [জাগিয়া উঠিল] বৎসগণ, তোমাদের আজ কি পাঠ দেব তা তোমরা জানো কি?

ছেলেরা। হাঁ পণ্ডিতমশাই, জানি আমরা।

পণ্ডিত। জানো তোমরা? অতি উত্তম, অতি উত্তম! তাহলে ত' ভালই হয়েছে। তোমরা যখন জানোই, তখন আর আমার নতুন করে' জানাবার আবশ্যক করে না।

[নাকে বেশ বড়ো একটিপ নস্য গুঁজিয়া
তিনি পুনরায় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন]

পদ্ম। বাঃ, পণ্ডিতমশাই তো আজ খাসা এক প্যাঁচ্ বের করছেন। বেশ ফাঁকি দিয়ে পড়াচ্ছেন? বেশতো?

সরোজ। ফাঁকি দিয়ে পড়াচ্ছেন না, পড়ানোয় ফাঁকি দিচ্ছেন? কি বল্‌ছিস্‌ তুই?

সলিল। পড়বার জন্যে তোদের যে ভারি উস্‌খুস্‌ দেখছি? এতক্ষণ যে আস্ত আছিস্‌ এই ঢের!

পদ্ম। না বাপু, এসব আমার একদম্‌ ভালো লাগছে না। একেই তো সংস্কৃতে আমরা মা গঙ্গা, তারপর যদি পণ্ডিতমশাই সাক্ষাৎ বৈতরণী হয়ে পড়েন তাহলেই তো ভেসে গেছি। তাহলে আমরা পাশ কর্‌ব কি করে?

সরোজ। বেশ, এবার যদি জেগে পণ্ডিতমশাই ফের আবার ঐ প্রশ্ন করেন আমরা অর্ধেক ছেলে বল্‌ব যে জানি, আর অর্ধেক ছেলে বল্‌ব জানিনে, তাহলে দেখা যাবে পণ্ডিতমশাই কি করেন। কি বলিস্‌?

মৃগেন। হ্যাঁ, সেই ভালো। দেখা যাক্‌ না, কি করে না পড়িয়ে তিনি পারেন!

সলিল। মৃগেন, ভাই, একটা কাজ কর্‌বি? পার্‌বি কর্‌তে? তোকে একটা কাঁচি দেব—

মৃগেন। কাঁচি নিয়ে কি করব?

সলিল। চুপ করে' আস্তে আস্তে পণ্ডিতমশায়ের পেছনে গিয়ে ওঁর ওই টিকিটা একেবারে গোড়া ঘেঁসে—

মিহির। হ্যাঁ, ওঁর ওই হৃষ্টপুষ্ট নধর তেল্‌তেলে—

পদ্ম। তেল্‌তেলে আর তুল্‌তুলে—

সলিল। চাকচিক্যময়—এবং চমৎকার—

পদ্ম। স্বর্গে যাবার ফাস্‌ট ক্লাস্‌ টিকিটখানা—

মৃগেন। না বাপু, আমি পারব না। পণ্ডিতমশাই আমাকে পুনঃ পুনঃ বারণ করেছেন।

পদ্ম। কি, টিকি কাটতে বারণ করেছেন নাকি?

মৃগেন। প্রকারান্তরে তাই বই কি! আমার নাম মৃগেন যে!

পদ্ম। মৃগেন তো কি হয়েছে?

মৃগেন। বাঃ, পণ্ডিতমশাই সেদিন কি পড়ালেন তাহলে? যে পড়া পারলুম না বলে' মার খেতে হোলো সেদিন? মার খেয়ে শিক্ষালাভ করেচি—ওসব টিকি-ফিকি ছাঁটার মধ্যে আমি নেই!

সলিল। মৃগেন তো টিকির কি?

মৃগেন। সেদিন কি পড়্লুম তবে? নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ! ওঁর কাছে আমি যাব না।

সরোজ। তোর মাথা, দে, আমাকে কাঁচি দে, আমিই কেটে দিচ্ছি।

মৃগেন। হ্যাঁ, তোর দ্বারাই হবে। তুই-ই পারিস্! তোর আর কি! নামেও তুই সরোজ—মার খেলে তার বেশি আর কি Sorrow হবে তোর? স্বনামধন্যই হয়ে যাবি বরং!

সরোজ। যা যা, বাজে বকিস্‌নে! কাঁচি দে! আমি হচ্ছি সরোজ অব্ স্টাম্! জানিস্, আমার নামে একটা বিলিতি বই আছে নামজাদা?

সলিল। তবে তো মাথা কিনে বসে' আছো আর কি! যাও, তাহলে এবার টিকিটাও কিনে নাও! [কাঁচি দিল]

[সরোজ কাঁচি লইয়া পণ্ডিতমশায়ের পিছনে গিয়া দাঁড়াইতেই, পণ্ডিতমশাই জাগিয়া উঠিলেন]

পণ্ডিত। হ্যাঁ, বৎসগণ, কি বল্‌ছিলাম? হ্যাঁ, পড়ানোর কথা —আজ তোমাদের আমি কি পড়াবো তোমরা তাহা জানো কি?

অর্ধেক ছেলে। না, পণ্ডিতমশাই, আমরা জানিনে।

বাকী অর্ধেক। হ্যাঁ, পণ্ডিতমশাই, জানি আমরা। আমরা জানি।

পণ্ডিত। উত্তম, উত্তম? অতি উত্তম! [টিকি নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।] আমি কি পড়াতে যাচ্ছি তা তোমাদের কতকের যখন জানা আছে এবং কতকের জানা নেই তখন এক কাজ করো। তোমাদের মধ্যে যারা জানো না তারা, যাদের জানা আছে তাদের কাছ থেকে জেনে নাও। এখন, আজকের মতো আমি আসি তাহলে। কেমন?

[উভয় নাকে নস্য গুঁজিয়া প্রস্থান

প্রথম দৃশ্য

রাস্তার ধারে পদ্মলোচনের বাড়ীর রোয়াক। প্রাতঃকাল।
পদ্মলোচন ও মিহির।

পদ্মলোচনের হাতে যত সব খবরের কাগজ।

পদ্মলোচন। তাই তো, এই পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে তো বড়ই একটু বেশী যেন! কি ক'রে যে কি করি—

মিহির। কোন্‌দিন না তোর পণ্ডিত-প্রাপ্তি ঘটে যায়।

পদ্মলোচন। ঘটলেই হোলো! প্রায় কেষ্ট-প্রাপ্তির কাছাকাছিই তখন দাঁড়াবে। এই তো সেদিন মান্‌কেকে, তাঁর নিজের ছেলেকেই, ক্লাসের মধ্যে এমন ঠ্যাঙন্‌টা দিয়ে দিলেন যে তার চীৎকারে হেডমাস্টার মশাইকে পর্যন্ত দৌড়ে আস্‌তে হোলো। তিনি এসে পড়লেন তাই রক্ষে, তা নইলে—

মিহির। মান্‌কের দফারফা হয়ে যেত? তাই নাকি?

পদ্মলোচন। রফা বলে' রফা! পণ্ডিতমশাই আরেকটু হলেই নিজের পিণ্ডলোপ করে' ফেলেছিলেন আর কি!

মিহির। বলিস্ কিরে? নিজের মানহানি, আই মীন, মান্‌কে হানি করে' বসেছিলেন?

পদ্মলোচন। করেছিলেনই তো! ওঁর যা রাগ, রাগ্‌লে তো আর জ্ঞান-গম্যি থাকে না, কেলাসে যে সময়টা তিনি ঘুমিয়ে থাকেন না, তার সবটাই তো তিনি রেগে টং হয়ে আছেন! আর রাগ্‌লে তাঁর তদ্ধিত প্রত্যয় পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায় দেখছিস্ তো? কারো হিতাহিতের কথা আর মনে থাকে না।

মিহির। দিন দিন আমাদেরও তাই বিভক্তি চটে যাচ্ছে!

পদ্মলোচন। মায়া মমতা বলে' কিচ্ছু তো নেই ওঁর শরীরে,—মারবার বেলায় উনি একেবারে মরীয়া—বেজায় নিস্বার্থপর—পরের ছেলেই কি আর নিজের ছেলেই কি!

মিহির। যাকে পাও মেরে ধরে ছেড়ে দাও। মন্দ কি? মারাত্মক উদারতাই বলা উচিত বরং।

পদ্মলোচন। তাই তো ভারি ভাবনাতেই রয়েছি ভাই! মান্‌কের আর কি, সে মোলে তবু পণ্ডিতের আরেক ছেলে থেকে যাবে। টেটো হতভাগাটাই থেকে যাবে। আস্ত গোটাটাই থাক্‌বে। কিন্তু আমি যে ভাই বাবার একমাত্র শিশু! আমি কাবার হলে কে থাক্‌বে আমাদের? তাছাড়া আমি মারা গেলে যে একেবারেই মারা পড়্‌বো?

মিহির। ভাবনার কথা বই কি! এইভাবে নিজের পরের যাবতীয় সবার সমস্ত পিণ্ডি লোপ কর্‌তে পণ্ডিতমশাই যদি উঠে পড়ে লেগে যান্—

পদ্মলোচন। বলেছিতো, পণ্ডিতের আর ভাবনা কি? তাঁর মানস-পুত্র খরচ হয়ে গেলেও, টেটো-পুত্র থেকেই গেল, সেই তাঁর পিণ্ডি দেবে গয়ায়।

মিহির। হ্যাঁ, টেটো আরো থাক্‌বে কি না! দাদার দশা দেখ্‌লেই তক্ষুনি সে পালিয়ে গিয়ে অন্য কারো পোষ্যপুত্র হয়ে যাবে। সেদিকটা পণ্ডিত ভেবেছে কি?

পদ্মলোচন। পণ্ডিতের ভাবনা পণ্ডিতের থাক্, এখন আমি যে কি করি! মহামুস্কিলেই পড়েছি—

মিহির। পণ্ডিতমশাই মান্‌কেকে ঠ্যাঙালেন কেন? আমি তো সেদিন ভাই ইস্কুল যাইনি। জ্বরবিকার না কি যেন আমার হয়েছিল—

পদ্মলোচন। তবে যে চিঠিতে লিখেছিলি তোর পেটের অসুখ?

মিহির। হ্যাঁ ঐ রকম একটা কিছু। পেটের অসুখও যা জ্বরবিকারও তাই,—তাই নয় কি? তুই-ই বল্? ছুটি পাওয়া নিয়ে হোল কথা। তা মান্‌কেকে মারলেন কেন পণ্ডিত?

পদ্মলোচন। কেন আর! পয়স্ শব্দের তৃতীয়ায় কী হবে বল্‌তে পারে নি, তাই।

মিহির। তাইতেই?

পদ্মলোচন। ঠিক তাইতে নয়। তারপর পণ্ডিতমশাই জিগ্যেস্ করলেন, পয়সা কি করে' হোলো শুনি। মান্‌কে ঘাড় মাথা চুল্‌কে বল্ল—সে ভারী মজার কথা বল্ল সে—

মিহির। কি—কি?

পদ্মলোচন। বল্ল, পয়সা? তা, টাকা ভাঙালেই তো হয় জানি!

মিহির। তারপর—তারপর?

পদ্মলোচন। তারপর পণ্ডিতমশাই তো রেগে বেগুণ! মান্‌কে বল্লে, আধুলি, সিকি, দুয়ানি সব ভাঙিয়েই পয়সা হয়, তবে টাকা ভাঙালেই বেশি পয়সা। এরপর আর পণ্ডিতমশাই নিজেকে সাম্‌লাতে পারলেন না। প্রথমে তো কিল চড় চাপট একচোট্ খুব কসে সাঁটালেন তারপরে আরো রাগান্বিত হয়ে আমাদের বেঞ্চিটার নড়বোড়ে পায়াটা আস্ত ভেঙে নিয়ে মান্‌কের ঘাড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মিহির। বলিস্ কি? পিতা পুত্রে তুমুল সংগ্রাম তাহলে?

পদ্মলোচন। মান্‌কেটা মার খাবার আগেই চীৎকার ছেড়েছিল—পেল্লায় রকমের বীভৎস এক চীৎকার—অনেকটা thanking in anticipation গোছের—বেঁচে গেল তাইতে! হেড্‌মাস্টার মশাই পাশের কেলাস থেকে এক লাফে এসে পড়লেন। তা নইলে সেই পায়ার ধাক্কায়, চারপায়ায় চেপে আরো পায়াভারী হয়ে সেইদিনই বেচারাকে নিমতলায় রওনা হতে হোতো। আমাদেরকেই কাঁধে করে' কষ্ট করে' বয়ে নিয়ে যেতে হোতো আর কি!

মিহির। বলিস্ কি? শুনেই তো আমার হৃৎকম্প হচ্ছে! মান্‌কের সেই চীৎকার না শুনেই—!

পদ্মলোচন। হ্যাঁ, নিনাদ একখানা ছেড়ে ছিল বটে মান্‌কে—! আর্তনাদের মত আর্তনাদ! সাইরেনের আওয়াজও বলা যায়। কিন্তু আমি যে কি মুস্কিলেই পড়েছি—

মিহির। তোর কি মুস্কিল হোলো আবার?

পদ্মলোচন। আমাকে কাল সমস্ত স্বরসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধি আর বিসর্গসন্ধি আগাগোড়া ঝাড়া মুখস্থ বল্‌তে হবে।

মিহির। কেন, তোর অপরাধ?

পদ্মলোচন। আমিও বল্‌তে পারিনি। সেই মান্‌কেটার মার খাবার দিনই ভাইরে! আমাকে বটবৃক্ষ সন্ধিবিচ্ছেদ করতে দিয়েছিল!

মিহির। বটবৃক্ষ? সে আবার কি সন্ধিরে?

পদ্মলোচন। কে জানে ভাই! বটবৃক্ষই বলতে পারে! আমার সাধ্য নয়।

মিহির। বট ছিল বৃক্ষ—বটবৃক্ষ? কিন্তু এর সন্ধি কোন্‌খান্‌টায়? বট যে বৃক্ষ—তাই না কি?

পদ্মলোচন। সে তো সমাস হয়ে গেল। যাকে ব' দ্বন্দ্ব সমাস! ওর আবার সন্ধি কোথায়?

মিহির। অন্ধি-সন্ধি কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছিনে।

পদ্মলোচন। থাক্‌লে তো পাবি? বট গাছের সব ডালে ডালে ঘুরে বেড়ালেও না—তার আগাপাশতলা হাতড়ালেও পাবিনে। আর কিছুনা, এ কেবল পণ্ডিতের আমাদের ধরে ধরে প্রহারের অভিসন্ধি। তাছাড়া আর কি?

মিহির। তা তুই কি বল্লি?

পদ্মলোচন। আমি বল্লাম যে বটগাছের ডালে দড়ি বেঁধে গলায় লাগিয়ে লট্‌কে পড়্‌লে একটা সন্ধি হয় বটে, কিন্তু সেটা কি ঠিক স্বরসন্ধি হবে? বিসর্গসন্ধিও হবে না বোধ হয়? বরং সেটাকে স্বর বন্ধ হয়ে স্বর্গের সন্ধি বল্‌লেও বল্‌তে পারা যায় হয়তো!

মিহির। বলেছিলি? বলেছিলি তুই! যাঃ।

পদ্মলোচন। ঠিক উচ্চারণ করে, বলিনি। তবে মনে মনে বলেছিলুম বই কি!

মিহির। [হতাশ হয়ে] মনে মনে? তাহলে আর কী হোলো? মজা কী হোলো? তা পণ্ডিতমশাই কি বল্লেন?

পদ্মলোচন। তিনি যা বল্লেন তা আমার বিশ্বাস হয় না। তিনি বল্লেন, বটো প্লাস্‌ ঋক্ষ—হোলো বটবৃক্ষ। এটা নাকি স্বরসন্ধিই—ওকারের পর ঋকার থাকিলে, উভয়ে মিলিত হইয়া তখন কি না কী যেন হয়ে যায়। আপ্‌না থেকেই হয়ে যায়।

মিহির। তা বটে? খুব আশ্চর্য তো!

পদ্মলোচন। তিনি বল্লেন যে বটু মানে হোলো ব্রাহ্মণ, তার সম্বোধনে বটো, আর ঋক্ষ মানে ভল্লুক। কিন্তু ভাই, বামুনের সঙ্গে ভল্লুকের কি সম্বন্ধ? আমি তো ভাই ভেবে পাইনে। বামুন কি আর সন্ধি করবার লোক পেল না—ভল্লুকের কাছে মরতে গেল?

মিহির। আমাদের পণ্ডিতের যতো সব ছিষ্টিছাড়া—

পদ্মলোচন। যা বলেছিস্! কিন্তু আমি—আমি না এই কথা যেই বলেছি, ঠিক মনে মনে নয়, মুখ ফুটেই বলে' ফেলেছি, পণ্ডিতমশাই চেয়ার থেকে নেমে এসে কান ধরে' আমাকে এই চাঁটি তো এই চাঁটি!—

মিহির। কান ধরে'? কার কান ধরে'?

পদ্মলোচন। আমার না তো আবার কার কান? পণ্ডিত নিজের কান ধরতে যাবে না কি?

[সরোজের প্রবেশ]

সরোজ। এইবার সেরেছে! সেকেণ্ড্ কোয়ার্টালির সংস্কৃতের সমস্ত খাতা এবার ভূতো পণ্ডিতের হাতেই পড়েছে রে! সর্বনাশ করেছে।

পদ্মলোচন। আমি পাশ করেছি কি না জানিস্?

মিহির। আমি কত নম্বর পেয়েছি রে?

সরোজ। সব রং নম্বর! ভূতো পণ্ডিতের হাতে আর কাউকে পাশ কর্‌তে হবে না। ওই যে মান্‌কেটা আস্‌ছে—এদিকেই আস্‌ছে—ওকেই জিগ্যেস কর না। বাবার আড়ালে যদি খাতাটাতা দেখে থাকে?

[মানসের প্রবেশ]

মানস। এই পদা, তোর হাতে ওসব কিরে?

পদ্মলোচন। যত রাজ্যের খবরের কাগজ। স্টেটস্‌ম্যান, বঙ্গবাসী, এডুকেশন গেজেট্ এই সব। বাবা পড়েন। পিয়নে দিয়ে গেল এইমাত্র। হাঁরে, মান্‌কে, পণ্ডিতমশাই না কি আমাদের খাতা দেখছেন? কত নম্বর পেয়েছি আমি?

মানস। [গম্ভীর মুখে] বোধ হয় এগারো।

পদ্মলোচন। মোটে? আর তুই?

মানস। পাঁচ কি সাত। তবে আমি বাবার অজান্তে নম্বরের আশে পাশে সংখ্যা বসিয়ে পঞ্চান্ন কি সাতচল্লিশ করে' নেব'খন। ভাগ্যিস্ তোর মতো এগারো পাই নি, তাহলে কি মুস্কিল যে হোতো! একশর মধ্যে একশ দশ তো আর পাওয়া যায় না।

মিহির এবং সরোজ } আর আমরা? আমরা?

মানস। তিন, দুই, জিরো। অনেকে আবার মাইনাস্ পাঁচ, মাইনাস্ সাত পেয়েছে; তারা সব 'ফ্রিজিং পয়েণ্টে' বসে আছে—সব 'বিলো জিরো'!

মিহির। চ' চ' নিজের চোখে দেখা যাক্ গিয়ে। যাবি খাতা দেখতে?

সরোজ। পণ্ডিতমশাই দেখালে তো!

মানস। যাবি তো চ'! আমার সঙ্গে খানিক দূর অবধি যেতে পারিস্! খাতা পর্যন্ত না হলেও বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি।

[সকলে উঠিল]

পদ্ম আচ্ছা আচ্ছা, চল্‌তো!

মানস। আমি কিন্তু ভাই তার বেশী এগুতে পারব না, আগে থেকেই বলে রাখছি। আমার বাড়ীর দোরগোড়া পর্যন্ত আমি আছি, তার পর আমি নেই। আমি কিন্তু বাবা, বাবার কাছে এগুবনা, তা কিন্তু বলে' রাখ্‌ছি বাবা!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পণ্ডিত ভূতনাথ শর্মার আলয়।

পণ্ডিতমশাই একমনে ছেলেদের খাতা দেখিতেছেন আর বলিতেছেন—আপন মনেই বলিতেছেন—

পণ্ডিত। নাঃ, এ হতভাগা সাড়ে তিনের বেশি কিছুতেই পেতে পারে না—পৌনে চার দিলে খুব বেশি দেওয়া হয়।

[পৌনে চার কাটিয়া সাড়ে তিন করিলেন]

সরোজটা কতো পেয়েছে? কতো দিলাম ওকে? য়্যাঁ? চার মেরে দিয়েছে—বলে কি! এত বেশি নম্বর পাবার—একেবারে চার প্রহার করবার—ছেলে তো ও নয়। কি করে মারল? দেখি, খাতাটা দেখি আরেকবার। ইস, তাই তো বলি! ভুলে দিয়ে ফেলিনি—যোগেই ভুল হয়েছে। সবশুদ্ধ থেকে মাইনাস্ সাত বাদ দিতেই ভুলে গেছি! বিয়োগান্তক সাত বাদ দিলে কিছুই তো অবশিষ্ট থাকে না। মোটমাট দেড় পায় ও। দেড়? উঁহু, আসলে দেড় নয়—মাইনাস্ দেড় তাও আবার! ছোঁড়াটা দেড়া মুখ্যু—ডবল মুখ্যুও নয়। ডবল হচ্ছে পদ্মটা—ওকে কাট্‌লে দুটো মুখ্যু বেরয়। তেম্‌নি পেয়েছেও রেকর্ড মার্ক!—মাইনাস্ সাড়ে ত্যারো! সংস্কৃতের এতখানি শ্রাদ্ধ করে' সার্ধ ত্রয়োদশ! তাও আবার মাইনাস্। অপোগণ্ডটা বলে কি যে বটবৃক্ষের মধ্যে আবার সন্ধি কোথায়? বলে কি না যে ভালুকের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই—বামুনের সঙ্গে জড়াজড়ি করতে গেছে! কেন কর্‌বে না শুনি? ভল্লুকরা তো তাই চায়—তারা তো মানুষ পেলেই জড়াজড়ি কর্‌বে—তাদের ধরে' ধরে' খাওয়া-দাওয়াই তো তাদের কাজ। প্রাত্যহিক কর্ম—নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া-পদ্ধতি যাকে বলে! তারা কি বটু—অবটু বাছে কখনো? ঐ পদ্মটাকেই যদি বাগে পায়,

ছাড়্‌বে নাকি? অচিরাৎ বিসর্গ সন্ধি করে' বস্‌বে। পদ্ম তো পদ্ম —স্বয়ং মহাপদ্ম আমাকে পেলেই কি সমীহ করবে নাকি? উহুঁঃ, সে পাত্রই নয় ঋক্ষরা! গোটা-ক্লাস-শুদ্ধ-আমি তেমন তেমন একটা ভল্লুকের পক্ষে এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন! একবেলার আহার্য মাত্র! তখন আর অন্য সন্ধি নয়—সাক্ষাৎ ব্যঞ্জন-সন্ধি! হুঁঃ!

[নেপথ্য হইতে ছেলেরা—"পণ্ডিতমশাই বাড়ী আছেন?"]

পণ্ডিত। কে রে? কে?

পদ্ম। আজ্ঞে, আমি পদ্ম—

মিহির। আমি মিহির—

সরোজ। আমি সরোজ।

পদ্ম [চাপা গলায়] আপনার সরোজ্ অফ্ দি স্যাটান্।

[বলিতে বলিতে বালকদের প্রবেশ]

পণ্ডিত। এই প্রাতঃকালে! কি মনে করে' বৎসগণ?

সরোজ। আজ্ঞে, আপনার জন্যে কিছু এনেছি—

পণ্ডিত। সয়তান কোথাকার! আমার সঙ্গে চতুরতা? চালাকি আমার সঙ্গে? ভালো চাও তো সরে' পড়ো এখান থেকে। এই দণ্ডেই অন্তর্হিত হও। নতুবা—নতুবা এই যষ্টি-খণ্ড দেখ্‌ছ তো! এর এক এক ঘায়ে এক একজনকে ছ ছ-খানা বানাব —আহ্লাদে আটখানাগিরি বেরিয়ে যাবে! যষ্ঠী বিভক্তি করে' ছাড়ব! হুঁঃ!

পদ্ম। আচ্ছা সার্! আমরা আপনাকে বিরক্ত কর্‌ব না, শুধু আমাদের নম্বরটা আপনি বলে' দিন।

মিহির। হ্যাঁ, সার্, কেবল কত পেয়েছি বল্লেই হবে, আর কিছু চাইনে।

সরোজ। সেই জন্যেই তো এই সকালে—এই প্রাতঃকালে এত কষ্ট করে' আসা—দয়া করে' বলে' দিন্ সার্—

পণ্ডিত। সব ইয়া ইয়া গোল গোল পেয়েছো। বুঝেছ পণ্ডিতের দল? আবার কী পাবে? এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো সুড় সুড় করে' সরে পড়ো দেখি। এই যষ্টিখণ্ড যদি তোমাদের পৃষ্ঠেই ভাঙি তাহলে আমার কতখানি পথকষ্ট হবে সেকথা ভেবেচ কি? গেঁটে বাত নিয়ে বিনা লাঠিতে হাঁটাহাঁটি করা আমার পক্ষে এই প্রৌঢ় বয়সে সম্ভব নয়। তাছাড়া, এই যষ্টিখণ্ড—

পদ্ম। আর আপনি আমাদের পৃষ্ঠভঙ্গ করে' দিলে বিনা পৃষ্ঠদেশে আমরাই বা কি করে' হাঁট্‌ব সার্? আপনিই বলুন্ না!

পণ্ডিত। বটে? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? আমার সহিত রসিকতা? হাস্য-পরিহাস আমার সঙ্গে? বটে বটে? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি—

সরোজ। সার, আপনার জন্য কিছু এনেছিলাম। কিন্তু কিছুটা যে কোথায় ফেল্লাম, মনে পড়্‌ছে না তো! পথে আস্‌তে আস্‌তেই হারালাম নাকি? কিচ্ছু মনে পড়্‌ছে না তো।

পদ্ম। আমরা নিজেরাই দেখে নেব। খাতাগুলো দেখিয়ে দিন না সার। আপনার পায়ে পড়ি।

পণ্ডিত। দাঁড়াও, এই লাঠিগাছ আমার পৈতৃক সম্পত্তি। এটা বিনষ্ট করা আমার অভিপ্রেত নয়। ভেতরে একটা বেড়াল-তাড়ানো ব্যাঁখারি আছে, সেইটা নিয়ে আসি।

[পণ্ডিতমশাই ভিতরের কক্ষে গেলেন]

মিহির। আর এখানে না, পালাই চ'।

সরোজ। এ যে দেখ্‌ছি গেছো পণ্ডিত বাবা। গাছ নিয়ে তাড়া করে।

পদ্ম। দাঁড়া, এক কাজ করা যাক্। বার থেকে ঠিক হেড্‌মাস্টার মশায়ের মতো গলা করে' ডাকি আয়—ভারি মজা হবে দেখিস্।

[পণ্ডিতমশায়ের পুনঃপ্রবেশ]

পণ্ডিত। এখনো দাঁড়িয়ে? বটে বটে? ভারি দুঃসাহস দেখছি। আস্পর্ধা কম নয়। দাঁড়াও, এই ব্যাঁখারি-প্রয়োগে ব্যয়রাম সারাচ্ছি তোমাদের।

[লাঠি লইয়া তাড়া করিতেই
'বাবারে মারে' বলিয়া ছেলেদের পিট্টান]

পণ্ডিত। উঃ, কী বদ্ এই সব বালকবৃন্দ। সাক্ষাৎ নাভিশ্বাস। ঋক্ষরা যে এত লোকের সঙ্গে সন্ধি করে, গায়ে পড়েই করে, বটু-অবটু পর্যন্ত বাছেনা, অথচ এই নাবালকদের কেন যে নেয় না আমি ভেবে পাইনে। নিলে আপদ্ যায়।—

পদ্ম। [নেপথ্য হইতে—হেড্‌মাস্টারের মতো মোটা গলায়] পণ্ডিতমশায় বাড়ী আছেন নাকি?

পণ্ডিত। [ব্যস্তসমস্ত ভাবে] আজ্ঞে হাঁ, আছি। আসুন —আস্‌তে আজ্ঞা হোক্—

[বলিয়া তাড়াতাড়ি দরজার নিকটে যাইতেই]

ওঃ, তোমরাই পাজীর দল? আমার সঙ্গে চাতুর্য? চতুরতা আমার সঙ্গে? পুনরায় আম্মার সঙ্গে রসিকতা? পুনঃ পুনঃ হাস্যপরিহাস? বটে বটে? বংশদণ্ডটা গেল কোথায়!—

[বলিয়া ব্যাঁখারিটা আনিতে যাইতেই]

ছেলেরা [নেপথ্য হইতে] ওরে বাবারে, পালা! শীগগির পালা। পণ্ডিত ক্ষেপেছে রে!

[ছেলেরা প্রস্থান করিলে
পণ্ডিতমহাশয় আবার খাতায় মন দিলেন]

পণ্ডিত [আপন মনে] ছেলে তো নয় এক একটি রত্ন! মাতা শব্দের সপ্তমীতে লিখেছে জামাতা! যা মাথা এক একখানা!

বাঁচলে হয়! হাঁ, ভালো কথা, ভালো মনে পড়ে গেছে—জংলী! এই জংলী! বাবা জঙ্গলেশ্বর। দর্শন দাও!

[জংলীর প্রবেশ]

জংলী। আইগা কর্তা।

পণ্ডিত। আমার জামা কোথায় রেখেছিস্?

জংলী। আইগা, সেইডা ত সোডা দিয়া কাইচা দিছি—

পণ্ডিত। কে বলেছে তোকে সোডা দিয়ে কাচতে? পরিষ্কৃত করতে পয়সা লাগে না? সোডার পয়সা কোথায় পেলি?

জংলী। আইগা, হাপনার ঐ জামার পাকিটেই একডা পয়সা আছল সেইডা দিয়াই সোডা হান্‌ছি—সেই সোডা দিয়াই—

পণ্ডিত। আমার মাথা খাইছস্!—হতভাগা কোথাকার!

জংলী। তা আইগা, একডা ফতুয়া কাচতি এক পয়সার সোডা লাগবেনা—হাপনি কহেন কি কর্তা?

পণ্ডিত। কে তোকে ফতুয়া কাচতে বল্লে? একটা ফতুয়া কাচতে এক পয়সার সোডা! এই করেই তুই ফতুর করবি আমায়। আমাকেই ফতুয়া করে' ছাড়বি।

জংলী। আইগা, ফতুর আপনে অইবেন না ফতুর অইব ধোপারা—ফতুর অইব নাপিতরা—

পণ্ডিত। ঠিক বলেছিস্। এ সপ্তাহে আর দাড়ি কামানো নয়। অনর্থক আমার একটা পয়সা জলে দিলি। পয়সাটা তুলতে হবে তো! হপ্তায় দু'দিন দাড়ি কামাতে যায় চার পয়সা—এক পয়সা পঙ্কোদ্ধার করতে চার পয়সা সাশ্রয়! যাঃ, আর দাড়িই কামাবো না—দাড়ি কামিয়ে কি হয়?

জংলী। আইগা, দাড়ি রাইখা ভাল একডা কোট অইব কর্তা—ওই দাড়ি দিয়াই অইব—ভাল একটা গড়ম কোট অইব—

পণ্ডিত। [বিস্মিত হইয়া] বলিস্ কি জংলী? ভেড়ার লোমে গরম কাপড় হয় শুনেছি—তাতে কোটই বানাও আর কামিজই বানাও—ফতুয়াও বানাতে পারস্—কিন্তু তা বলে' মানুষের দাড়িতে—তুই বলিস্ কিরে জংলী— ?

জংলী। আইগা কর্তা, দাড়ি দিয়া অইব না, দাড়ি রাইখা যে পয়সা জম্‌ব সেই পয়সাতেই কোট অইব।

পণ্ডিত। কোট কি রে পাগল, কোঠাবাড়ী হতে পারে। হিসেব করে' ছাখ্‌তো, দু'বার কামাতে হপ্তায় চার পয়সা মাসে ষোল পয়সা, বৎসরে দুই মুদ্রা, ষাট বৎসরে এক শত কুড়ি মুদ্রা—য়্যাঁ? য়্যাতো টাকা—একশো—কুড়ি টা—কা!

[বিরাট হাঁ করিয়া ফেলিলেন]

জংলী। হাপনার বিকট হাঁ-ডা থামান কর্তা, হামার বুক কেমন কাঁপতিছে—

পণ্ডিত। বুক কাঁপ্‌বার কথাই যে রে জংলী। মোটে তো কুড়ি টাকা মাইনে পাই···দশশো বিশশো নয়, তার যদি এত টাকা দাড়ি কামাতেই বেরিয়ে যায়, জামা কাচাতেই যদি নিঃস্ব হয়ে পড়ি—তাহলে চল্‌বে কি করে'? একটু বুঝে-সুঝে খরচ করিস্, বুঝ্‌লি বাপু?

জংলী। আইগা কর্তা।

পণ্ডিত। যা বাপু, যা আমার সাম্‌নে থেকে যা—তোকে যতই দেখ্‌ছি ততই আমার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একটা জামা কাচ্‌তে একটা পয়সা—গোটা একটা পয়সা—একেবারে নগদ,—হায়—হায়। আমার সাম্‌নে অমন করে' দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে, যা।

জংলী। আইগা কর্তা।

পণ্ডিত। ফের বদন-ব্যাদন করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌লি?

জংলী। আইগা কর্তা, খামাখাই গাল দিবেন না—ভালো অইব না—

[জংলীর বাহিরে প্রস্থান

পণ্ডিত। [পুনরায় খাতায় মনোনিবেশ]। নাঃ আর ছাই কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। খাতা দেখে কি হবে? সকালবেলাতেই পুরো একটা পয়সা বাজে খরচ হয়ে গেল—দূর্ দূর্। সারাটা দিন আজ অতিশয় খারাপ যাবে।

[খাতাগুলি লইয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে গেলেন]

[হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের প্রবেশ]

হেড্‌মাস্টার। পণ্ডিত মশাই কই? চাকরটা যে বল্ল, বাইরের ঘরেই উনি রয়েছেন। নাঃ, ছেলেদের খাতাগুলো একবা দেখা দরকার। সব ছেলেই নাকি সংস্কৃতে ফেল্ করেছে শুন্‌ছি। ভালো কথা নয় তো। [উচ্চৈঃস্বরে] পণ্ডিতমশাই! পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত। [নেপথ্য হইতে] পদা, আবার এসেছিস্! দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি! আজ তোরই একদিন—কি—আমারই একদিবস—

হেড্‌মাস্টার। আমি পদা নই—আমি তারকবাবু—হেড্‌মাস্টার—

পণ্ডিতমশাই। [নেপথ্য হইতে] আর ধৃষ্টতা করতে হবেনা—যাচ্ছি লাঠি নিয়ে—

[লাঠি হস্তে পণ্ডিতের সবেগে প্রবেশ]

হেড্‌মাস্টার। য়্যাঁ, একি পণ্ডিতমশাই? এসব কি? লাঠি কেন? ছেলেরা তাহলে বলে মিথ্যে নয়। পড়ানোর চেয়ে পেটানোর দিকেই আপনার বেশি মনোযোগ। ছেলেরা যে আপনাকে দেখ্‌তে পারেনা তার কারণ আছে তাহলে।

পণ্ডিত। আজ্ঞে—আজ্ঞে—একটু আগেও পদা ছোঁড়াটা

এখানে এসে ভারী উৎপাৎ করে' গেছে—আমি মনে করেছিলুম সেই আবার এসেছে বুঝি! নইলে আমি আপনাকে—আপনাকে কি আমি লাঠি মার্‌তে পারি? আপনি আমাদের হেড্‌মাস্টার—ইস্কুলের মাথা—আমাদের সকলের গৌরব—আপনাকে কি লাঠি মারা যায়?

হেড্‌মাস্টার। যাক্ গে, যেতে দিন। আর কখনো এমন করবেন না। আর হ্যাঁ, কাল্‌কেই সব খাতা সাব্‌মিট করতে হবে. বুঝেছেন? আমি চল্লাম—

পণ্ডিত। আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না—এই যষ্টি—আজ্ঞে—এই লগুড় আপনার উদ্দেশে আনীত নয়। সেই বেয়াক্কেলে পদা ছোঁড়াই আমাকে এভাবে ত্যক্ত করে বিপদে ফেলেছে। আজ্ঞে—বুঝ্‌লেন কিনা—

হেড্‌মাস্টার। থাক্ থাক্। যা হবার হয়ে গেছে।

পণ্ডিত। আপনার গায়ে লাগেনি তো? লেগেছে কি? লাগলেও তেমন খুব লাগেনি ত? আজ্ঞে, সমস্তই ওই পদা নামক দুর্বৃত্তের কাণ্ড—

হেড্‌মাস্টার। [হাসিয়া] পদার কাণ্ড যে তা বুঝ্‌তে পেরেছি। আচ্ছা, এখন আসি। হ্যাঁ, আর শুনুন, কাল সোমবার ইন্‌স্‌পেক্‌টার আস্‌ছেন—স্কুল ভিজিট্ করতে আসছেন। সুতরাং, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, ভালো কাপড় জামা পরেই ইস্কুলে যাবেন বুঝেচেন কিনা? আচ্ছা আসি তবে।

পণ্ডিত। আজ্ঞে সে কথা আর বল্‌তে হবেনা। জামা কাপড় পরে' যাব বই কি! পরিষ্কার জামা-কাপড়েই যাব। সেজন্য ভাববেন না।

[হেড্‌মাস্টারের প্রস্থান

জংলী! ওরে জংলী। জংলী হতভাগা কোথায় গেলি আবার?

[জংলীর প্রবেশ]

জংলী। আইগা কর্তা, ডাক্‌তিছেন ?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্‌তিছি। একটা জামা কিনে আন্‌তে পার্‌বি ? আনতো এখুনি।

জংলী। আইগা পয়সা কোথায় ? আমার লগে তো মোড দেড়ডা পয়সা আছে, দেড় পয়সায় জামা আইব না।

পণ্ডিত। ভারী ওপর-চালাক হয়েছিস্ তুই। না ? সব কথায় তোর ফোপর-দালালি। ঐখানে তাকের ওপরে আট আনা পয়সা আছে, তাই দিয়ে একটা জামা কিনে আন্‌গে—নিলামী টিলামী যা সুলভে পাস্, সস্তায় পাবি, নিয়ে আস্‌বি—একটু ফরসা দেখে আনিস্, পরিষ্কৃত দেখে বুঝ্‌লি ? পাশের নিলামী দোকান থেকে নিয়ায় না কেন, সস্তা হবে।

জংলী। আইগা হ।

[জংলীর প্রস্থান

পণ্ডিত। একেই বলে দুর্ভাগ্য ! যখনই আজ সকালে একটা পয়সা জলে গেছে, তখনই জানি, আজ অনেক লোকসান্ বরাতে আছে। আট—আট আনা অপব্যয়। দাড়ি না কামিয়ে যদি বা দু পয়সা বাঁচিয়েছি অম্‌নি ইন্সপেক্টার এসে হাজির ! হা হতোস্মি ! পদা হতভাগার যখন আজ সকালে দগ্ধ মুখ দেখেছি তখনই জানি যে আজ পদে পদে বিপদ ! তার ওপর এই নাহক্ দণ্ড—অষ্ট আনা বৃথা নষ্ট ! হায় ! হায় !

[জামা লইয়া জংলীর প্রবেশ]

জংলী। এই লন্ কর্তা। লম্বা জামা কাপড় আর ত পালাম না ! জামা ভালই অইছে, কেবল হাতা দুইডা একডুক লম্বা—

পণ্ডিত। দেখি, দেখি। [হাতা মাপিয়া] তা ভালোই

কিনেছিস্। হাতাটা একটু কেটে রাখিস্ তাহলেই হবে। এই আঙুল চারেক, তাহলেই হবে! বুঝ্লি?

জংলী। আচ্ছা, তাই করুম্ কর্তা!

[জংলীর প্রস্থান এবং মানসের প্রবেশ]

পণ্ডিত। মানস, শোনো তো বাপু। এদিকে এসো। পড়াশুনায় তো একটি হস্তীমূর্খ হয়েছ। একটা কাজ পারবে? এই জামার হাতাটা আঙ্গুল চারেক কেটে রেখো দিখি। কাল ইন্সপেক্টার আস্ছেন কিনা ইস্কুলে—এই পরেই তো যেতে হবে। জংলীটাকে বলেছিলাম—ওরে মনে থাক্‌বে কিনা কে জানে—যা ওর মেধা-শক্তি! তুমি পারবে কেটে রাখতে? চারি অঙ্গুলি মাত্র, বেশী না।

মানস। পারব বাবা। কেটে রেখে দেব একসময়ে চার অঙ্গুলি তো? আপনি ভাববেন না।

[মানসের প্রস্থান

পণ্ডিত। হাঁ, ভাবব না! তাহলেই হয়েছে। আজকালকার ছেলেদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছ কি গেছ! যা পড়াই, যা বলে দি, সবই ভুলে মেরে দিচ্ছেন—প্রত্যহের পড়া তাই মনে রাখতে পারছেন না, উনি আবার জামার কথা স্মরণে রাখবেন। তাহলেই হয়েছে। না, ওদের বাক্যে আস্থাস্থাপন করা আদৌ সমীচীন নয়। আমি নিজেই কেটে রাখি—

[কাঁচি লইয়া কর্তন]

চার আঙুল কাট্‌লে কি হবে? আরো কাটা দরকার। আরো আঙুল চারেক কাটি—

[পুনরায় কর্তন—মাপিয়া দেখিয়া]

একটা হাতা আরেকটার চেয়ে একটু ছোটো হয়ে গেল—তা হোক্, বেশ মানাবে কিন্তু।

[পণ্ডিতের প্রস্থান

[জংলীর প্রবেশ]

জংলী। কর্তায় ত কইছে কাল তেনাগো ইনফাট্টার বাবু আইব—তরাতরি জামাটা কাইটা রাখি—

[কাঁচি দিয়া জামার হাতা-কর্তন ও প্রস্থান

[মানসের প্রবেশ]

মানস। বাবা বলছিলেন হাতাটা কেটে রাখ্‌তে। কখন আবার ভুলে যাব, যাই, চার অঙ্গুলি কেটে রেখে দি—নইলে বাবা যা বদ্‌রাগী—বাব্‌বা! আমারই চারটে আঙুল না কেটে নেন্।

[কাঁচি দিয়া জামার হাতা-কর্তন ও প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

ইস্কুলের ঘর

ইস্কুলের ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা। পণ্ডিতের ক্লাসে পণ্ডিত অনুপস্থিত—ছাত্ররা বসিয়া জটলা করিতেছে। সরোজ, মিহির, সলিল, মৃগেন, পদ্মলোচন, প্রভৃতি এবং আরো অন্যান্য ছাত্র।

সরোজ। পণ্ডিতমশায়ের হোলো কি আজ? এত দেরি কেন রে?

সলিল। ফার্স্ট্ পিরিয়ডেই ওঁর ক্লাস ভুলে গেছেন বোধ হয়?

মিহির। ফাসট্ পিরিয়ডের ক্লাসে কবে আর উনি ঠিক সময়ে এসে পৌছন্—ওঁর তো নাইতে খেতে আর মন্তর আওড়াতেই বারোটা বেজে যায়।

সরোজ। সব দিন আর আজ কি সমান? আজ ইন্সপেক্টার আস্‌চেন ইস্কুল ভিজিট্ করতে, আজ বারোটা বাজালে—

সলিল। তাহলে বারোটা বেজে যাবে পণ্ডিতের। ইন্সপেক্টারই বারোটা বাজিয়ে দেবেন।

মিহির। তাহলে ভারী জব্দ হয় পণ্ডিত। এতদিন যতো আমাদের ঠেঙিয়েছে একদিনে সব শোধ হয়ে যায়।

সলিল। ইনস্‌পেক্‌টার এসে পড়ে এক্ষুনি, বেশ হয়—

সরোজ। এসে পড়্‌ল বলে'—দেরি নেই আর—

সলিল। বাস্তবিক, এত দেরি—পণ্ডিত মশায়ের এত দেরি তো কক্ষনো হয় না। কতক্ষণ ইস্কুল বসে গেছে—কিরে, পদা, তুই কিছু কথা বলছিস্ না রে? চুপ্ করে' কেন?

পদ্মলোচন। ভাই, ইস্কুলে আস্‌বার সময় আমি একটা ভালুক দেখেছিলাম, রাস্তায় একজন নাচাচ্ছিল, তাই আমি ভাব্‌চি কি, পণ্ডিতমশাই আস্‌তে আস্‌তে পথে দেখা পেয়ে, সেই ভালুকটার সঙ্গে কোলাকুলি বাধিয়ে বসেন নি ত?

সলিল। [সবিস্মিত] ভালুকের সঙ্গে? ভালুকের সঙ্গে কোলাকুলি? কেন—ভালুকের সঙ্গে কেন?

পদ্মলোচন। বাঃ, পণ্ডিতমশাই বামুন যে! ভালুকেরা ভারি পছন্দ করে কিনা বামুনদের—

সলিল। বামুন হলেই বা! ভালুকের সঙ্গে কোলাকুলি করার প্রয়োজনটা? ভালুক কিছু প্রিয়জন নয় যে—

পদ্মলোচন। বাঃ, ভালুকের আর বামুনের মধ্যে সন্ধিসূত্র রয়েছে যে রে! আর আমাদের পণ্ডিতের যে রকম সন্ধির দিকে ঝোঁক্! ভালুক পেয়েছে কি আর কথা নেই—অম্‌নি তাকে পাঁজাকোলা করে' পাক্‌ড়েছেন! সেই কথাই তো ভাবছি আমি।

[এমন সময়ে ইন্‌সপেক্‌টার সহ হেড্‌মাস্টারের প্রবেশ—
ক্লাসের সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল]

ইন্‌স্‌পেক্‌টার। একি, এখন পর্যন্ত ক্লাস-টিচার আসেন নি?

হেড্‌মাস্টার। আজ্ঞে, পণ্ডিতমশাই একটু বুড়ো মানুষ কি

না !—কোন কারণে হয়তো একটু দেরী হচ্ছে আজ—কোনো দিন তো এমন হয় নি।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার। মে বি ওল্‌ড্‌, বাট্‌ হি মাস্‌ট্‌ বি পাংচুয়াল্‌। এই দৃশ্য দেখে আমি ভারি দুঃখিত হলাম—

[পণ্ডিতমশাই সেই হাতকাটা জামা গায়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত ছেলেরা দেখিয়া হাসিয়া উঠিল।]

হেড্‌মাস্টার। একি, এ বেশ—এ রকম বেশ কেন?

পণ্ডিত। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

ইন্‌স্‌পেক্‌টার। ইনিই আমাদের পণ্ডিতমশাই? আপনি স্কুলের আইন-কানুন কিছু জানেন না? স্কুলের ডিসিপ্লিন্‌ আপনি ভঙ্গ করছেন। বাধ্য হয়ে আপনার ত্রিশ টাকা জরিমানা কর্‌তে হচ্ছে। এ-মাসের বেতন থেকেই সেটা কাটা যাবে আপনার।

হেড্‌মাস্টার। [ছেলেদের দিকে চাহিয়া] তোমাদের আজ ছুটি! কালও ছুটি! ইন্‌স্‌পেক্‌টার মশায়ের শুভাগমনের জন্যে ইস্কুল একদিন বন্ধ দেওয়া হোলো!

[সকলে চলিয়া গেল।

পণ্ডিতমশাই মাথায় হাত দিয়া একাকী বসিয়া রহিলেন।]

চতুর্থ দৃশ্য

ইস্কুলের সেই ক্লাস ঘর—পদ্ম, সরোজ, মৃগেন, মিহির, সলিল, মানস প্রভৃতি এবং পণ্ডিতমহাশয়। ছেলেরা পড়িতেছে, গোল করিতেছে, পণ্ডিতমহাশয় পড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন।

[হেড্‌মাস্টার প্রবেশ করিলেন।]

হেড্‌মাস্টার। সবাই মিলে তোমরা সংস্কৃতে ফেল্ করলে কি করে’?

[ছেলেরা—চুপ্‌]

হেড্‌মাস্টার। তোমাদের মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না কি? য়্যাঁ? তা না হলে এমন চমৎকার রেজাল্ট্‌ হয় কি করে’?

পদ্ম। পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়ান্ না সার!

পণ্ডিত। [রাগিয়া] কি? অধ্যাপনা করি না? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

হেড্‌মাস্টার। [পণ্ডিতকে বাধা দিয়া] থামুন্ আপনি,—তোমাদের কি বল্‌বার আছে বলো?

পদ্ম। পড়্‌তে চাইলে উনি আমাদের ধরে’ ধরে’ বটবৃক্ষে ঝুলিয়ে দ্যান্!

হেড্‌মাস্টার। [সবিস্ময়ে] বটবৃক্ষে ঝুলিয়ে দ্যান্? সে কি? সে আবার কি!

পদ্ম। আজ্ঞে, আমাদের বটবৃক্ষের সন্ধিবিচ্ছেদ করতে বলেন।

হেড্‌মাস্টার। বটবৃক্ষের সন্ধি আবার হয় না কি? য়্যাঁ? কী বলেন পণ্ডিত মশাই? অবশ্যি, দা-কুড়ুল নিয়ে হৈ চৈ করে’ বটবৃক্ষের সঙ্গে লাগ্‌লে, যুদ্ধ একটা করলেও করা যায় হয়তো, কিন্তু বটবৃক্ষের সঙ্গে সন্ধি? সে আবার কি রকম?

মৃগেন। আজ্ঞে, তাইতো সার্! তা আমরা পারব কেন? তা কি পারা যায়?

মিহির। আমরা ছেলেমানুষ তো!

সলিল। যুদ্ধ করতেই পারব কি না কে জানে, সন্ধি তো ঢের পরের কথা।

হেড্মাস্টার। বটবৃক্ষের কি সত্যই কোনো সন্ধি হয় নাকি পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত। নিশ্চয়ই হয়। অনিবার্যরূপেই হয়। স্বরসন্ধিই হয়ে যায়। বটু শব্দের অর্থ বিপ্র, বটুর সম্বোধনে হবে বটো, যেমন প্রভুর সম্বোধনে প্রভো, তদ্রূপ আর কি! উক্ত বটোর সহিত ঋক্ষ, অর্থাৎ ভল্লুকের সংযোগ ঘটিলেই ও-কারের পর ঋ-কার থাকার দরুণ ও-কার ঋ-কার সম্মিলিত হইয়া—

হেড্মাস্টার। বুঝেছি, বুঝেছি। সে একটা কিছু হবেই। মারাত্মক কিছুই হবে। আর বল্তে হবে না। ওরকম যোগাযোগে ভয়ঙ্কর কিছু না হয়ে যায় না।

পণ্ডিত। অপিচ, উদাহরণও রয়েছে, যথা :—"বটবৃক্ষঃ ময়াদৃষ্টঃ ধারিবারণ মস্তকে—"

হেড্মাস্টার। হয়েচে! হয়েচে! আর বল্তে হবে না। যখন শাস্ত্রে লেখা রয়েছে তখন আর কথা কি! হতেই হবে। তবে, তবে কেন তোমরা বল্ছ যে পণ্ডিতমশাই তোমাদের পড়ান না?—

পদ্ম। আজ্ঞে, সেদিন আমি পণ্ডিত মশাইকে একটা শ্লোকের মানে জিজ্ঞেস্ করলুম, অবশ্যি পড়ার বাইরে। আন্সীন্ প্যাসেজ তো আমাদের য়্যাডিশনালে থাকে। তা পণ্ডিত মশাই তার মানেই বল্লেন না—

পণ্ডিত। [রাগে ফুলিতে ফুলিতে] কি? কোন্ শ্লোকের অর্থ আমি করি নাই? শ্লোকার্থ জানি না—আমি! [দাঁত কি

মিড় করিয়া] নিয়ে আয় তোর কোন্ শ্লোক আমি অর্থ করিতে পারি নাই।

হেড্ মাস্টার। বলো—ভয় কি? বলে' ফ্যালো। তোমার মনে নেই বুঝি?

পদ্মলোচন। হ্যাঁ, আছে। এই শ্লোকটা সার্—বল্‌ব—বল্‌ব সার্?

হেড্‌মাস্টার। বলো বলো, ভয় কি? আমি তো রয়েছি।

পদ্ম। হবর্ত্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেডুয়ে।

আণ্ডীবঃ অণ্ডক্রয়েন মানষ্টেটঃ শিবাঙ্গব ॥

হেড্‌মাস্টার। [ভাবিত হইয়া] আচ্ছা, আবার পড়ে শোনাও তো।

পদ্ম। [পুনরায় পাঠ] হবার্ত্তাবা—ইত্যাদি।

পণ্ডিত। য়্যাঁ? এমন তো কখনো শুনিনি। আমার সারা জন্মে এহেন শ্লোকের সাক্ষাৎ লাভ করি নাই।

হেড্‌মাস্টার। একটু একটু যেন বোঝা যাচ্ছে। উপনিষদ্ কিম্বা পাঁজির বোধ হয়, কি বলেন?

পণ্ডিত। বোধ হয় কোনো উদ্ভট শ্লোক। উদ্ভট গ্রন্থ থেকে এর মর্মোদ্ধার করতে হবে। আমি আজ বৈকালেই এর অর্থ করে' দেব, ও যেন মনে করে সমভিব্যাহারে আমার বাড়ী যায়।

পদ্ম। না সার্, সাম্‌নে দুর্গাপূজা, আমি যেতে পারব না—

হেড্‌মাস্টার। দুর্গাপূজা তো কি হয়েছে? দুর্গাপূজার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ?

পদ্ম। সামনে দুর্গাপূজা এই সময়টা আমি বিছানায় শুয়ে থাক্‌তে পারব না সার্!

হেড্‌মাস্টার। বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে কেন?

[ভারি বিস্মিত হইলেন]

সরোজ। পদ্মর ভয় পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী গেলে উনি মেরে ওর ঠ্যাং ভেঙে দেবেন—

হেড্‌মাস্টার। [হাসিতে লাগিলেন] না না, ঠ্যাং ভাঙবেন কেন? তাছাড়া, ঠ্যাং কিছু ক্ষণভঙ্গুর নয়—

[পণ্ডিতের প্রতি]

তা, পণ্ডিত মশাই, ওটার অর্থ আপনি স্কুলেই কাল্‌কে বল্‌বেন, তাহলেই হবে। আমারও জানার কৌতূহল থাক্‌ল। একটু ঘেঁটে দেখবেন, ঐ পাঁজি-টাজি, কিম্বা আপনাদের ঐ উপনিষদ্-টুপনিষদ্! ঐ দুটোই তো যতো রাজ্যের শ্লোকের আড়ৎ কিনা আপনাদের—

পণ্ডিত। বেশ, আমার স্মরণে রইল—

পঞ্চম দৃশ্য

পণ্ডিতের বাড়ী

পণ্ডিতমশাই প্রকাণ্ড এক সংস্কৃত অভিধান নিয়ে ব্যাপৃত।

পণ্ডিত। আজ সাতদিন যাবৎ এই শ্লোকটা নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই এর কিনারা করতে পারছি না। উদ্ভট সংগ্রহটা তো পাতি পাতি করে খুঁজলাম—কোনো দিকেই শ্লোকটার কোনো সুরাহা হচ্ছে না তো!

[নাকে এক টিপ্ নস্য নিলেন]

নাঃ, পণ্ডিত চাক্‌রিটা আর টিক্‌ল না বোধহয়—একেই তো ইনস্-পেক্‌টার মশাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সম্বন্ধে সুকঠোর মন্তব্য করে' গেছেন তারপর যদি এই শ্লোকটার সদর্থ না করতে পারি তাহলেই অনর্থ ঘট্‌বে—হেড্‌মাস্টারমশাইও খাপ্পা হয়ে যাবেন। নাঃ, বিংশতি

মুদ্রার এই দুর্ল্লভ চাক্‌রিটা আর থাকে না। এবং এই সামান্য আয় থেকে ত্রিংশতি মুদ্রার জরিমানাই বা দেব কোন্ উপায়ে?

[পুনরায় নাকে আর এক টিপ্ নস্য দান]

নাঃ, ভাল করে' মাথা ঘামাতে হোলো। শব্দকল্পদ্রুম্‌টা নিয়ে একবার দেখা যাক্। জীবনে এজাতীয় অদ্ভুত শ্লোকের সাক্ষাৎ লাভ করি নাই—কাশী বিদ্যাপীঠে কিম্বা ভট্টপল্লীতেও না, এ কোন্ বজ্জাতীয় শ্লোক রে বাবা!

হবার্ত্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেড়ুয়ে।
আণ্ডীবঃ অণ্ডক্রয়েন মানষ্টেটঃ শিবাঙ্গবঃ॥

[অভিধানের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে]

'হবার্ত্তাবা'? সংস্কৃত বলেই' বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু অভিধানে তো এবম্বিধ শব্দ নেই। বার্ত্তা মানে তো সংবাদ, কিন্তু 'হ…বা র মাঝখানে পড়ে' এতো বোধগম্য হবার বহির্ভূত হয়েছে। 'কহিপ্তাশা'? হিপ্ত ছিল আশা, হোলো হিপ্তাশা। কিন্তু হিপ্ত মানে কি? কী বস্তু এই হিপ্ত? য়্যাঁ? একি আমাকে ক্ষিপ্ত করার চক্রান্ত নাকি? 'শিবাঙ্গবঃ'—কেবল এই শব্দটার অর্থ অনুধাবন করা তত কঠিন নয়, কিন্তু 'টজেগেণঃ'ই বা কি আর 'শকেড়ুয়ে'…? ঐ 'শকেড়ুয়ে'…?

[নেপথ্যে একটা আওয়াজ শুনিতেই তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—]
এই! কে যাচ্ছিস্ ওখান দিয়ে? টেটো?

[নেপথ্য হইতে অর্ধস্ফুট—'আজ্ঞে না']

পণ্ডিত। মান্‌কে নাকি? টেটোকে এক ছিলিম্ তামাক দিতে বল ত? কিঞ্চিৎ ধূম্রপান আবশ্যক।

মানস। [প্রবেশ করিল] টেটো এখন কোথায় টো টো করছে কে জানে!

পণ্ডিত। তবে তুইই সাজ্। গড়গড়াটা আমায় দিয়ে ধূম্র-লোচনকে ডেকে আন্ একবার।

মানস। সে আসবে না।

পণ্ডিত। বলিস্, মাভৈঃ! আমি অভয় দিয়েছি, কোনো ভয় নেই। আর হ্যাঁ, তাকে ধূম্রলোচন বলে' যেন ডাকিস্নে, পদ্মলোচন বলেই ডাক্‌বি! বুঝ্‌লি?

মানস। যে আজ্ঞে—

[গড়গড়া দিয়া মানসের প্রস্থান

পণ্ডিত। দেখি, আর একবার উদ্ভটকল্পতরুখানা নেড়ে-চেড়ে দেখি, ধূমপান সেরে ধুম্‌ধাম্ করে' লাগা যাক্!

[তামাক টানিতে টানিতে]

নস্যতে তো কুলিয়ে ওঠা গেল না, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগিয়ে যদি সুবিধা করতে পারি। 'টজেগণঃ শকেড়ুয়ে' নাঃ, সমস্তই ক্রমশঃ আরো বেশী ধোঁয়াটে হয়ে আস্‌ছে যেন। 'আণ্ডীব অণ্ডফ্রয়েন' এযে কী বস্তু তাহার রহস্য ভেদ করব কি অনুমান করতেই আমি নাস্তানাবুদ!

[পদ্মলোচন ও মানসের প্রবেশ]

এই যে ধূম্রলোচন,—ওঁ শ্রীবিষ্ণু—বাবা পদ্মলোচন, না না, আর

[পদ্মলোচন প্রণাম করিতে উদ্যত]

প্রণাম করতে হবে না, বোসো। তুমি কি শ্লোকটার অর্থ জানো? জানো নাকি?

পদ্মলোচন। আজ্ঞে জান্‌লে কি আর জিজ্ঞাসা করি সার?

পণ্ডিত। তা বটে, তাওত বটে! আচ্ছা, তোমার কি ঠিক স্মরণে আছে কথাটা আণ্ডীব, গাণ্ডীব নয়? গাণ্ডীব কথার একটা অর্থ হয়; গাণ্ডীবী মানে অর্জুন, অর্থাৎ, সব্যসাচী।

পদ্মলোচন। কথাটা আণ্ডীব, আমার বেশ মনে আছে।

পণ্ডিতমশাই। [ঘন ঘন তামাক টানিতে টানিতে] সমস্ত শ্লোকটাই তোমার বেশ স্মরণ আছে, কোথাও ভুল করোনি?

পদ্ম। হ্যাঁ, পণ্ডিত মশাই!

পণ্ডিত। তবে—তাইত—তাইত! আচ্ছা তুমি যাও তাহলে।

[পদ্মের প্রস্থান

মানুকে, যাতো, ওঘরের কুলুঙ্গি থেকে বৃহৎ শব্দার্থ সংগ্রহটা নিয়ে আয়তো! একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি—

মানস। [সাহস সঞ্চার করে] আমি ওর একটা লাইনের মানে করে' দিতে পারি বাবা।

পণ্ডিত। [অভিধানের পাতা থেকে চোখ তুলিয়া] য়্যাঁ? কোন্ লাইনের?

মানস। দ্বিতীয় লাইনের। যদি আণ্ডীব-এর জায়গায় হয় আণ্ডিলঃ আর শিবাঙ্গবের জায়গায় হয় গবাংগবঃ।

পণ্ডিত। [অত্যন্ত বিস্ময়ে] বলিস্ কি? যা বলেছিস্, আর বলিস্ না। আমি মহামহোপাধ্যায় হয়ে হিম্‌সিম্ খাচ্ছি আর তুই কিনা—একটা দুগ্ধপোষ্য বালক হয়ে—মূঢ়তা দ্যাখো! যা বলেছিস্ বলেছিস্—আর বলিস্ না—কদাপি না—আচ্ছা, আচ্ছা, কী বলত, শুনি?

মানস। [ইতস্ততঃ করিতে থাকে] বলব?

পণ্ডিত। বলতেই তো বলছি।

মানস। আণ্ডিলঃ। মানে এক আণ্ডিল, কিনা এক গাদা, অণ্ডফ্রয়েন অর্থাৎ অণ্ড মানে ডিম্ব, ফ্রয়েন মানে ফ্রাই করে' অর্থাৎ কিনা এক ঝুড়ি ডিম ভেজে নিয়ে—, মানষ্টেটঃ—মানষ্টেট……

পণ্ডিত। ওইখানে ত আমারও আট্‌কাচ্ছে রে! [বিজ্ঞের মত এক টিপ্ নস্য লইয়া]—ওই মানষ্টেটই হোলো মারাত্মক!

মানস। আমি কিন্তু বুঝ্‌তে পেরেছি বাবা! মানষ্টেটঃ বলব? ওটাতে পদ্ম হতভাগা আমাদের ওপর কটাক্ষ করেছে, অর্থাৎ কিনা মানস আর টেট, আমি আর আমার ভাই।

পণ্ডিত। বটে? [অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া] সমস্তটা জড়িয়ে মানে কি হোলো তবে?

মানস। অর্থাৎ কি না, এক গাদা ডিম ভেজে নিয়ে মানস আর টেট গবাং গবঃ—গব গব করে' গিলছে।

পণ্ডিত। আমার পুত্রদের নামে এরূপ মিথ্যাপবাদ দেয় এতদূর তার স্পর্ধা—?

মানস। বোধ হয় ও দেখছিল।

[পণ্ডিতের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল,
তিনি আর্ত্তনাদে ফাটিয়া পড়িলেন]

পণ্ডিত। কী আমার পুত্র হয়ে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করে' তোদের এই জঘন্য কীর্তি? তোরা কিনা ডিম্ব গলাধঃকরণ করিস? হংসডিম্ব কি কুক্কুটাণ্ড কে জানে!

[মানসকে মারিবার জন্য নিজের চর্মপাদুকা খুলিলেন—]

মানস। [নিরাপদ ব্যবধানে সরিয়া গিয়া] ওই জন্যেই তো আমি বলতে চাই না। আপনার মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল বলেই তো বল্লাম।

পণ্ডিত। মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল! এখন যে আমার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হেলো, তার কি?

[জংলীর প্রবেশ]

জংলী। আইগা, কর্তা, হেড্‌মাস্টারের লগ থেকে লোক আইছে। ডাকৃব তেনারে? ওই আস্‌তিছে—ভিতরেই আস্‌তিছে—

[স্কুলের কেরাণীর প্রবেশ]

কেরাণী। আজ্ঞে, হেড্‌মাস্টার মশাই আপনার খবর নিতে পাঠালেন। আট আট দিন হয়ে গেল, কেন আপনি ইস্কুলে

আস্‌ছেন না, কি হয়েছে আপনার? তাই তিনি জান্‌তে পাঠিয়েছেন।

পণ্ডিতমশাই। তাঁকে বলুনগে—সমস্তই হয়েছে। প্রায় সমস্তই,—কেবল বাকি আছে 'শকেড়ুয়ে'; ওইটা হলেই হয়ে যায়।

কেরাণী। আচ্ছা, তাই বলে' দেব।

[কেরাণীর প্রস্থান

পণ্ডিত। [জংলীর প্রতি] আর দাঁড়িয়ে কেনরে হতভাগা? দেখ্‌ছিস্ কি? পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি বাঁধ্‌—এখানকার চাঁটিবাটি উঠ্‌ল। ডেরা তুল্‌তে হোলো এখান থেকে। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে ফ্যাল্, আজ বৈকালের গাড়ীতেই প্রস্থান করব। একেবারে মহাপ্রস্থান করব এখান থেকে।

জংলী। আইগা কর্তা! সেই ভালো!

ষষ্ঠ দৃশ্য

পদ্মলোচনের বাড়ীর রোয়াক্—পদ্মলোচন বসিয়া আছে
পোস্টাপিসের পিয়ন আসিয়া একগাদা খবরের কাগজ
দিয়া গেল—এডুকেশন্ গেজেট, সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ,
বঙ্গবাসী স্টেট্স্‌ম্যান, ফ্রেণ্ড অব
ইণ্ডিয়া—ইত্যাদি

[সলিল প্রবেশ করিল]

সলিল। আচ্ছা শ্লোক ঝেড়েচিস্ ভাই! পণ্ডিতকে দেশছাড়া করে' তবে ছাড়্‌লি!

পদ্ম। দেশছাড়া কি রকম?

সলিল। পণ্ডিতমশাই চলে' যাচ্ছেন যে এখান থেকে। আজ বিকেলেই চুপি চুপি নাকি সরে' পড়্‌ছেন। জিনিসপত্র গোছানো হচ্ছে সব। মান্‌কের কাছ থেকে জেনে এলাম।

পদ্ম। দূর, তাকি হয়?

সলিল। পালাতে হচ্ছে বেচারাকে, পালিয়ে বাঁচতে হচ্ছে—হেড্‌মাস্টারমশাই নাকি ভারী তাড়া দিয়েছেন। শ্লোকের মানে না জেনে নাকি হেড্‌মাস্টারের ঘুম হচ্ছে না, বার বার লোক পাঠাচ্ছেন—তাও আমি জেনে এলাম। এ কী শ্লোক রে বাবা!

পদ্ম। হ্যাঁ, শ্লোক একখানা বটে! [পদ্মলোচন হাসে]

সলিল। শ্লোক বলে' শ্লোক! দারুণ শ্লোক! পণ্ডিতমশাই একেবারে 'টজেগেণঃ'!—সমস্ত গেনের আশা ত্যেজে, লাভের আশা ত্যাগ করে,—আমাদের ধরে' ধরে' পিট্‌বার দুরাশাও ছেড়ে দিয়ে একেবারে সরে' পড়ছেন!

পদ্ম। হ্যাঁ, শ্লোকের মত শ্লোক! পণ্ডিত তাড়ানো শ্লোক—তা বটে! [পদ্মলোচন হাসে]

সলিল। অবিশ্যি, মান্‌কে একটা মানে করেছে বটে, অর্থাৎ তুই নাকি তাকে আর তার ভাইকে লক্ষ্য করেই ওটা বেঁধেছিস ?

[পদ্মলোচনের হাসি আর থামে না]

পদ্ম। মান্‌কের ছাই মানে। ও তো ডিমের মানে !

সলিল। [উৎসুক হইয়া] তবে আসল মানেটা কি ভাই ? বলবিনে আমাদের ?

পদ্ম। মানে এই যে আমার হাতেই রয়েছে !

সলিল। ও তো সব খবরের কাগজ।

পদ্ম। আরে, এদের নামগুলোই ওলোট-পালোট ক্‌রে' দিয়েছি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে' ছাখনা ! উলটো দিক থেকে একটু এদিক্ ওদিক্ করে' পড়লেই ওর মানে হবে, এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, বঙ্গবাসী, স্টেটসম্যান্ আর ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া।

সলিল। য়্যাঁ ? [বিস্ময়ে হতবাক্]

সপ্তম দৃশ্য

পণ্ডিতের বাড়ী—পণ্ডিত এবং জংলী।

পণ্ডিত। [বিষণ্ণ মুখে] চাক্‌রিটা ভালোই ছিল রে জংলী ! মাস গেলেই বিংশতি মুদ্রা, ছাত্রগুলোও নেহাৎ মন্দ ছিল না—কিন্তু এমন সব ভুল করে, অশুদ্ধ বলে, উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারেনা যে শুন্‌লেই চিত্তির জ্বলে যায়। পিত্ত পর্যন্ত জ্বলন্ত হয়ে ওঠে ! হাত নিস্‌পিস্ করতে থাকে—কিছুতেই আর সাম্‌লাতে পারি না। আত্মসম্বরণ করা শক্ত এমন রাগ হয়ে যায়।

জংলী। আইগা কর্তা, রাগ হচ্ছি চণ্ডাল—

পণ্ডিত। ঠিক বলেছিস জংলী ! প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনো

ওদের মারবনা, এখানে পণ্ডিতি করি আর নাই করি, আর কখনো ওদের গায়ে হাত তুলবনা। দুগ্ধপোষ্য শিশুরা সব, আর ওদেরই বা দোষ কি, ম্লেচ্ছ ভাষা এসে একেবারে ওদের মাথা খেয়ে দিয়েছে। মাতৃভাষা, ম্লেচ্ছ-ভাষা, দেবভাষা, কোন্‌টাতে ওরা মন দেবে?— একটা তো মোটে মন! আর সংস্কৃতও তো খুব সহজ বস্তু নয়!

জংলী। আইগা কর্তা! এক পয়সার সোডায় একটা ফতুয়া কাচা আপনে সহজ কইছেন্?

পণ্ডিত। ধুত্তোর ফতুয়া! ফতুয়ার নিকুচি করেছে—

[নেপথ্যে। পণ্ডিত মশাই বাড়ী আছেন?]

পণ্ডিত। এইরে! এই-এই! হেড্‌মাস্টার মশাই এসেছেন— যা যা, ভাঙা চেয়ারটা নিয়ে আয় গে।

[হেড্‌মাস্টারমশাই প্রবেশ করিলেন, জংলী একটা হাতাহীন, পিট-ভাঙ্গা চেয়ার আনিয়া স্থাপিত করিল।]

হেড মাস্টার। একি, এত বাঁধাছাঁদা কেন? ব্যাপার কি? য়্যাঁ?

পণ্ডিত। আজ্ঞে, ঐ 'শকেড়ুয়ে'। ও আর আমার দ্বারা হয়ে উঠ্‌লোনা। কিছুতেই ও মানে বার কর্‌তে পার্‌লাম না। আমাকে মাপ কর্‌বেন।

হেড্‌মাস্টার। 'শকেড়ুয়ে' কি বল্‌ছেন? 'শকেড়ুয়ে'? সে কি? সে আবার কি?

পণ্ডিত। আজ্ঞে, ঐ শকেড়ুয়ে!

হেড্‌মাস্টার। হোয়াট শকেড়ুয়ে? ইউ ডু এ শক্ টু মি, পণ্ডিট!

জংলী। আইগা, ওই শোলক্‌ই তো ওনার কাল আইল! ওই শোলোকের লাগাই তো উনি ইহান্ তে পলাইবার লাগছেন।

হেড্‌মাস্টার। কী শোলোক্? কোন্ শোলোক্ পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত। সেই হবার্ত্তরা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেড়ুয়ে—

হেড্‌মাস্টার। ওঃ, সেই শ্লোক! সে-শ্লোকের কথা আমি তো ভুলেই গেছি। ওর মানে খুঁজে পাননি? অভিধানে কিম্বা উপনিষদেও না? পাঁজিতেও নয়? না পেলেন তো কী হয়েছে? ওসব শ্লোক্‌-টোক যেতে দিন! ও নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছেন?

পণ্ডিত। আজ্ঞে, পণ্ডিত হয়ে শ্লোকার্থ করতে অক্ষম, সেক্ষণে আমার পণ্ডিতির কাজ করা কি উচিৎ? আমার ইস্তফা দিয়ে চলে যাওয়াই কি কর্তব্য নয়?

হেড্‌মাস্টার। ইস্তফা দিয়ে চলে যাবেন! সে কি কথা? আপনি আমাদের এতদিনের বন্ধু, আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, বল্‌ছেন কি আপনি?

পণ্ডিত। আজ্ঞে, তাই বল্‌ছি! ইন্‌স্‌পেক্‌টার মশায়ের জরিমানার টাকাটা, আমার এ মাসের বেতন থেকে কেটে নেবেন। কিন্তু বেতন তো পাই বিংশতি মুদ্রা, ত্রিংশতি মুদ্রা জরিমানা দেব কোত্থেকে? দশ মুদ্রার জন্য দেখছি আপনাদের কাছে আমায় চিরঋণী থাকতে হবে।

হেড্‌মাস্টার। হ্যাঁ, সেই কথাই তো বল্‌তে এসেছি। একটা সুখবর আছে। ইন্‌স্‌পেক্‌টার মশাইকে সেই কথা জানিয়েছিলাম, তাতে উনি বল্লেন, বিশ টাকা বেতন তার ত্রিশ টাকা জরিমানা— একটু খারাপ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু তার আর কি করা যাবে, যখন হুকুম্‌ হয়ে গেছে তখন তো আর রদ্‌ বদল করা সম্ভব নয়—

জংলী। আইগা কর্তা, যা বল্‌সেন্‌! হাকিম লড়ে তো হুকুম লড়ে না।

হেড্‌মাস্টার। আমি কিন্তু অনেক লড়লুম, অনেক বোঝালুম ইন্‌স্‌পেক্‌টার মশাইকে। বল্লুম সব বেতন কেটে নিলেতো পণ্ডিত মশাই না খেয়েই সপরিবারে মারা পড়বেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে চান না। কিছুতেই ফাইন্‌ মাপ করতে রাজি হলেন না।

অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে, ফাইন্ মাপ না করে' আরেকটা ফাইন্ কাজ তিনি করলেন! ফাইন্ কাজই বটে! বল্লেন তিনি, তার আর কি হয়েছে, এক কাজ করুন না? পণ্ডিতমশায়ের বেতন বাড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা করে' দিন আজ থেকে—তাহলেই উনি জরিমানাটা দিয়ে দিতে পারবেন, অনায়াসেই দিতে পারবেন।

পণ্ডিত। আপনি কি বল্‌ছেন আমি বুঝতে পারছিনা।

হেডমাস্টার। অর্থাৎ ইন্‌স্‌পেক্‌টারের হুকুমে আপনার বেতন এ মাস থেকে পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেল তবে এ মাসে আপনি কুড়ি টাকাই পাবেন কেবল, কেননা জরিমানার টাকাটা কাটা যাবে কিনা, তবে এর পর থেকে মাস মাস পঞ্চাশ—

পণ্ডিত। য়্যাঁ? বলেন কি হেডমাস্টারমশাই? একি সম্ভব? স্বপ্ন না সত্যি? আমি জাগ্রত অবস্থায় দণ্ডায়মান হয়েই নিদ্রা দিচ্ছি না তো? [মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন] এই জংলী, তুই আমাকে একটা চিম্‌টি কাটতো! আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

[জংলী খুব জোরে এক চিম্‌টি কাটিল]

উঃ! বাপ! জেগেই আছি তাহলে! য়্যাঁ?

জংলী। আইগা, আরার্‌ডা কাটুম্ কর্তা?

[চিম্‌টি কাটিতে অগ্রসর]

পণ্ডিত। [ব্যস্ত হইয়া] না না, আর কাটতে হবে না—একটাতেই টের পেয়েছি। যথেষ্ট হয়েছে।

জংলী। বেশ টের পাইছেন তো কর্তা?

[ফুলের মালা ইত্যাদি লইয়া, পদ্ম, সরোজ, মিহির সলিল প্রভৃতির প্রবেশ]

পণ্ডিত। তথাপি একটা বাধা আছে। আমার এখানে থাকা চলে না হেডমাস্টার মশাই।

হেড্‌মাস্টার। কেন, কেন? আবার কী বাধা?

পণ্ডিত। ছেলেরা আমাকে চায় না। তাছাড়া—তাছাড়া আমি তাদের পড়াবার যোগ্যও নই। আমার যাওয়াই উচিত। হ্যাঁ, যাওয়াই উচিত আমার। হেড্‌মাস্টার মশাই, কিছু মনে করবেন না, আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন। সেজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ, কিন্তু এখানে থাকা আমার আর চলে না। আমার গাড়ীরও আর বিলম্ব নাই! নমস্কার! আমি চলি! জংলী, মোটঘাটগুলো নিয়ে ইস্টিশনে আয়—

[বিদায় লইতে উদ্যত

ছেলেরা। পণ্ডিত মশাই, আপনি আমাদের মাপ করুন! আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। এবার থেকে আমরা খুব ভালো ছেলে হবো, খুব মন দিয়ে পড়বো। আপনি দেখে নেবেন। আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আপনি গেলে আমাদের পড়াবে কে?

পণ্ডিত। [ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া] না, তাহলে আমি যাবনা এবার থেকে খুব ভাল করে' পড়াব তোমাদের। আর—আর কদাচ তোমাদের গায়ে আমি হাত তুল্‌ব না। আর কখনো মারব না তোমাদের—

[ছাত্ররা পণ্ডিতমশায়ের গলায় মালা পরাইয়া দিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। পণ্ডিত মশাই তাহাদের আশীর্বাদ করিলেন।]

যবনিকা

বাজার করার হাজার ট্যালা
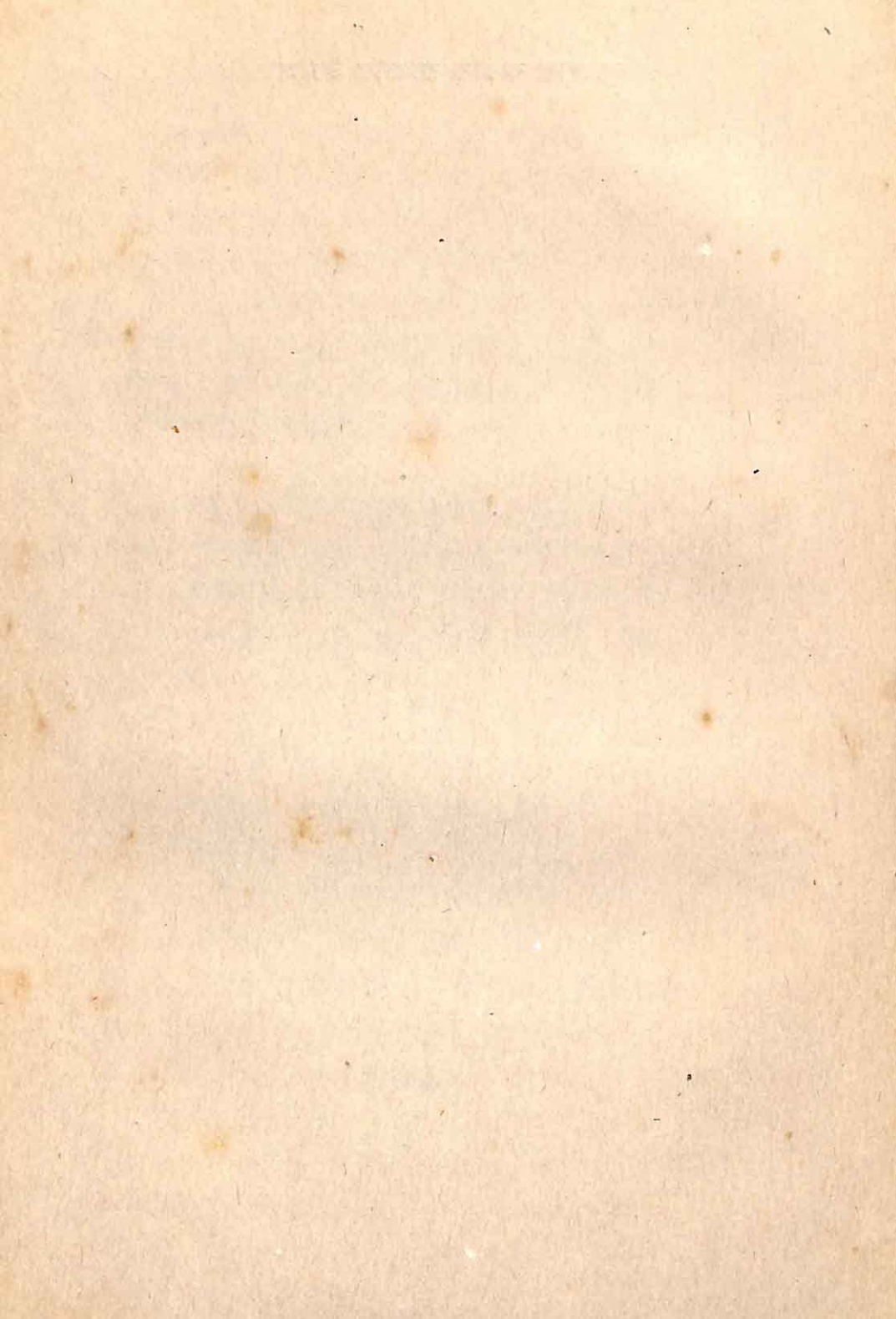
বাজার করার হাজার ঠ্যালা

একটি সাজানো-গোছানো সাহেবী দোকানের মধ্যে,—এই নাটিকার—সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছে।—হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন দুই ভাই। ক্রমশঃ আসবে বাঙালীবাবু, সাহেব বিক্রেতা, বেয়ারা, মেম্ বিক্রয়িত্রী, বড় সাহেব।

হর্ষবর্ধন। হ্যাঁ, দোকান বটে একখান্! দেখছিস্ গোব্রা?

গোবর্ধন। দেখছি দাদা! সাহেবদের কাণ্ডই আলাদা! দোকান করেছে, না, একটা ইন্দ্রপুরী বানিয়ে রেখেছে! তাকিয়ে ছাখো না। দেখ্চ ত? তা হবে না কেন? সাহেব বলেচে কেন? মোসাহেব বল্লেও তো পারত!—

হর্ষবর্ধন। সনাতন খুড়ো বলেছিল সাহেবী দোকানে পাওয়া যায় জিনিসটা। কিন্তু এ যা দোকান—যা পেল্লায় কাণ্ড একখানা —এর কোন্খানে যে ঢুঁ মারবো—

গোবর্ধন। চার ধারই তো ঢুঁ ঢুঁ!—

হর্ষবর্ধন। খুড়োর আর কি, বলেই খালাস। এখন আমরা সারা দোকান তালাস্ করি, হাত্ড়ে মরি চারধার্!

গোবর্ধন। কাকেই বা জিজ্ঞেস করি—কেই বা জানে!

হর্ষবর্ধন। আর জানলেও কি বল্বে? জানতে যাবেই বা কে? আমার তো ভাই সাহস হচ্ছে না।

গোবর্ধন। এই মেম্টাকে জিজ্ঞেস্ করো না কেন? ওতো দোকানীদেরই একজন, জিনিস বেচছে বলেই বোধ হচ্ছে আমার।

হর্ষবর্ধন। দূর! ওকি বলতে পারে? মেম্ যে!

গোবর্ধন। বাঃ, পারবে না? কেন, মেম্ কি মেয়েমানুষ নয়? মেয়ে মানুষই তো! আর মেয়েদের অজানা কী আছে?

হর্ষবর্ধন। তা বটে, তা বটে। তা' বটে, তুইই জিজ্ঞেস কর।

গোবর্ধন। তুমিই করো দাদা।

হর্ষবর্ধন। কী ভীতুরে! (ফিস্ ফিস্ করেন) কর্না গোব্রা! ভয় কিসের?

গোবর্ধন। উঁহু!

হর্ষবর্ধন। ভয় কি তোর? আমিতো আছি, এই কাছেই রয়েছি। ভয় নেই, কাম্ড়ে দেবে না!

গোবর্ধন। উঁহু! মেম্ যে—!

হর্ষবর্ধন। কী কাপুরুষ! এই জন্যেই তোকে আমি ছু চোখে দেখতে পারি না। তোর ঐ ভীতুপণার জন্যেই!— সাহেবী দোকানে নিয়ে আসাই তোকে ভুল হয়েছে। মেম্ দেখেই তোর চক্ষুস্থির—সাহেব দেখলে তো ভির্মিই খাবি দেখছি।

গোবর্ধন। ঐ যে বাঙালী বাবুটি এধারে আসছে, তাকেই জিজ্ঞেস করা যাক না!

বাঙালী বাবু। (এগিয়ে আসেন) কী চাই আপনাদের?

হর্ষবর্ধন। আমাদের? আমার? না—আমার কিছু চাই না। আমাদের গাঁয়ের সনাতন খুড়ো—তারই একটা জিনিস চাই, তার জন্যেই কিনতে আসা।

বাঙালী বাবু। কি জিনিস বলুন।

হর্ষবর্ধন। আপনাদের এই সাহেবী দোকান থেকে অনেক দিন আগে একটা মাখন তোলার কল তিনি কিনে নিয়ে গেছলেন। আমাদের সনাতন খুড়ো। সেই কলের, মশাই, একটা খুরি গেছে হারিয়ে। সেই কলেই লাগানো থাকতো সেই খুরি—সেই খুরিটাই চাই।

বাঙালী বাবু। মাখন কলের খুরি? খুরিটা কি রকমের বুঝিয়ে দিন তো!

হর্ষবর্ধন। আমি কি আর দেখতে গেছি? হারিয়ে গেল তার আর দেখলাম কখন?

গোবর্ধন। কি রকম আর? এই খুরি যেমন হয়! যেমন হয়ে থাকে খুরিয়া।

[একজন সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান্ এগিয়ে আসেন]

সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান্। হোয়াট্ বাবু?

হর্ষবর্ধন। ইয়েস্ সার্। ইয়েস্—উই ওয়াণ্ট্—উই ওয়াণ্ট্ এ খুরি—

সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান্। খুরি—হোয়াট্?

হর্ষবর্ধন। ইয়েস্ সার্, খুরি। এ খুরি, সার্।

সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান্। খোরি? দি স্পেলিং?

হর্ষবর্ধন। হোয়াট্ সার্?

বাঙালী বাবু। বানান্ করতে বলছে।

হর্ষবর্ধন। ও! বানান্? খুরি—খ-য়ে হ্রস্ব-উ—

গোবর্ধন। উঁহুহু। ইংরেজি বানান্। বাংলা কি বুঝবে সাহেব?

হর্ষবর্ধন। ও! ইংরেজি! বুঝেচি। খুরি—কে-এচ্-ইউ-আর্-আই!

গোবর্ধন। 'আই'—তুমি ঠিক জানো? ওয়াই-ও তো হতে পারে?

হর্ষবর্ধন। পাগল! ওয়াই হয় কখনো? বি-এল্-এ ব্লে, বি-এল্-ই ব্লি, বি-এল্-আই ব্লাই। তারপরে বি-এল্-ও ব্লো, বি-এল্-ইউ—ব্লিউ, বি-এল্-ওয়াই ব্লোয়াই।

গোবর্ধন। তাহলে খুরি করতে তুমি খুরাই করেচ যে।

হর্ষবর্ধন। তাই নাকি? তাই ত! নো সার্ নট্ আই—বাট্ 'ই'—ওন্‌লি 'ই' সার্।

সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান্। ব্রিং দি চেম্বার্‌স্।

বাঙালী বাবু। (বেয়ারাকে হাঁক দ্যান্) বেয়ারা, চেম্বার লে আও!

বেয়ারা। জী হুজুর! [চেম্বার্‌স্ ডিক্সনারী লইয়া আসে।]

গোবর্ধন। বাবাঃ কী মোটা বই একখান্। ইংরেজী মহাভারত নাকি? তাই বোধ হয়!

বাঙালী বাবু। মহাভারত নয়, অভিধান। ইংরেজী অভিধান মশাই!

সাহেব-সেল্‌স্‌ম্যান্ (ফস্ ফস্ করে' পাতা ওল্‌টান্)।

কে-এইচ্-ইউ—কে-এইচ-ইউ…ড্যাম্ ইওর্ খুরি! নাথিং অফ্ দি কাইণ্ড্ ইজ হিয়ার। বাবু টেক্ দেম্ টু মিস্টার ম্যাক্‌ফার্‌সন্! হি মাইট্ আণ্ডার্‌স্টাণ্ড্।

[সেল্‌স্‌ম্যান্ সাহেবের প্রস্থান]

বাঙালী বাবু। এই বেয়ারা! বাবু লোগ্‌কো বড়া সাব্‌কো চেম্বারমে লে যাও!

[বাঙালী বাবুর প্রস্থান]

হর্ষবর্ধন। দুজনেই চলে গেল দেখছি।

গোবর্ধন। বাবা, সাহেবটার কী আওয়াজ গো!

হর্ষবর্ধন। হবে না কেন? গোরু খায় যে! গোরুর আওয়াজটা কি কম? ডাক্‌ব? ডেকে দেখাব একবার? হা-হাম—

গোবর্ধন। (দাদার মুখ চেপে ধরে) চুপ্ চুপ্!

হর্ষবর্ধন। ব্-ব্-ব্-ব্-ব!

গোবর্ধন। কর্‌চ কি? ধরে নিয়ে যাবে যে!

হর্ষবর্ধন। হুঁঃ, নিয়ে গেলেই হোলো! মাইরি আর কি!

গোবর্ধন। ভুল করে' গোরু মনে করে' ধরতে পারে তো? তখন খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ?

বেয়ারা। চলিয়ে, চেম্বার্‌মে চলিয়ে।

হর্ষবর্ধন। চেম্বার্‌মে? কেয়া বোল্‌তা হ্যায়?

গোবর্ধন। য়্যাঁ? কী বলছে দাদা? অভিধানের মধ্যে যেতে বল্‌ছে নাকি আমাদের?

হর্ষবর্ধন। চেম্বার্‌মে যানে হোগা?

বেয়ারা। জী হুজুর!

গোবর্ধন। [ভীত কণ্ঠে] আমাদের অভিধানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে নাকি দাদা?

হর্ষবর্ধন। হ্যাঁঃ! ঢোকালেই হোলো! কেমন করে' ঢোকায় দেখাই যাক্ না একবার! এত বড়ো মানুষটাকে চেম্বারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে—অত সোজা না। আমরা কি জলছবি? যে লাগিয়ে দিতেই অভিধানের গায়ে গিয়ে সেঁটে যাবো অম্‌নি।

বেয়ারা। জারাসে ঠাহ্‌রিয়ে। মেম্‌সাব্‌ আব্‌ ভিতর গিয়া। হিঁয়া বৈঠিয়ে আপ্‌লোগ্‌। কল্ হোনে সে হাম তুরন্ত লে যায়েঙ্গে।

গোবর্ধন। [আরো সন্ত্রস্ত হয়] কলের মধ্যে নিয়ে পিষে ফেলবে না তো দাদা? অভিধানের কলের মধ্যে ফেলে—?

হর্ষবর্ধন। হ্যাঁ! ফেললেই হোলো! পিষে দিলেই হোলো আর কি! ভারী পিসেমশাই এসেছেন। আমরা ঢুকতে যাব কেন কলে? আমরা কি ইঁদুর? ইঁদুররাই কেবল বোকার মতন কলের মধ্যে ঢোকে।

গোবর্ধন। দারোয়ানটার গোঁফজোড়া দেখেছ?

হর্ষবর্ধন। দেখেছি। কেন, বল্‌তো?

গোবর্ধন। যাকে বলে শিকারী বেড়াল। আর খুরি কিনে কাজ নেই দাদা! পালাই চলো এখান থেকে। গতিক বড়ো সুবিধের নয়।

হর্ষবর্ধন। তুই ভারী ভীতু গোব্‌রা। সব তাতেই তুই ভয় খাস্‌। দারোয়ান—অভিধান—মেম্‌ যা দেখিস্‌ তাতেই। ঐ সেই মেম্‌টা আমাদের এদিকেই আবার আসছে যেন। আয়, আমার আড়ালে দাঁড়া।

গোবর্ধন। এলই বা! মেম্‌কে আমার ভয় কিসের?

হর্ষবর্ধন। তাই তো কে বলে! মেম্‌দের তো গোঁফও নেই দারোয়ানের মতো, তবে আর ভয় কি! কিন্তু তুই যা ভয়-কাতুরে—তাই বলে কে!

[মেমের আগমন]

মেম্‌-সেলস্‌ম্যান্‌। হোয়াট্‌ আর ইউ ডুইং হিয়ার, বাবু?

হর্ষবর্ধন। [তটস্থ হয়ে] ইয়েস্‌ সার্‌!

মেম্‌। ডোণ্ট সার্‌ মি! সে—ম্যাড্যাম্‌।

হর্ষবর্ধন। [আরো ঘাব্‌ড়ে গিয়ে] ইয়েস্‌ সার্‌!

মেম্‌। [দাব্‌ড়ি ছায় এবার] সে ম্যাড্যাম্‌!

হর্ষবর্ধন। ইয়েস্‌ ড্যাম্‌!

মেম্‌। হু দি ডেভিল্‌ ইউ আর?

[বিরক্ত হয়ে মেমের প্রস্থান]

হর্ষবর্ধন। উঃ! মেম্‌ না ঐকটা জগঝম্প! দোকানখানা যেন কাঁপিয়ে চলে গেল। বাঁচা গেল বাপ!

গোবর্ধন। তুমি ড্যাম্‌ বল্লে কি না, মেম্‌টা রাগ করে' চলে গেল তাইতে। ড্যাম্‌ একটা গালাগালি যে! জানো না?

হর্ষবর্ধন। আমাকে মা-ড্যাম্‌ বলতে বলছিল।

গোবর্ধন। বললেই পারতে।

হর্ষবর্ধন। হ্যাঁ, আমি ওকে মা বলতে যাই আর কি! খেয়ে দেয়ে কাজ নেই আমার! কেন! বলব কেন! আমার বাবা কি ওকে বিয়ে করতে গেছে সাত পুরুষে?

গোবর্ধন। মা কেন? ম্যা তো! ম্যা বলতে কি হয়েছে? তা বললে এমন কিছু ক্ষতি হোতো না!

হর্ষবর্ধন। মা-ও যা ম্যা-ও তাই—একই মানে। আমাদের ভাষায় যাকে মা বলি, ওদের ভাষায় তাকেই বলে ম্যা!

গোবর্ধন। না দাদা—তা নয়!

হর্ষবর্ধন। [খাপ্পা হন] ইংরিজির তুই কি জানিস্? আমার চেয়ে বেশি জানিস্ তুই? তুই শেখাবি আমাকে? আমাকে আর শেখাতে হয় না ইংরিজি!

গোবর্ধন। কিন্তু চটে গেল তো মেম্‌টা!—

হর্ষবর্ধন। বয়েই গেল আমার। মেয়ে-সাহেব দেখে মোটেই ভয় খাইনে আমি। আমি কি তোর মতন কাপুরুষ? তোর মতো মুখ্যুও নই!

গোবর্ধন। ছাগলরাও তো ম্যা বলে! তুমি কি বলতে চাও যে ছাগলরাও তাহলে সাহেব?

হর্ষবর্ধন। বেড়ালেও তো ম্যাও বলে, তবে কি তুই বলছিস্ বেড়ালরা সব ছাগল? তা নয়রে হাঁদা, তা নয়! যদি আমার মত অনেক ভাষা তুই জানতিস্ তাহলে আর ও কথা বল্‌তিস্ না। ইতর প্রাণীদের ভাষার মধ্যে ওরকম মিল প্রায়ই থাকে। থেকেই যায়! না থেকে পারে না।

গোবর্ধন। ছাগলের ভাষায় আর সাহেবদের ভাষায় তোমার কিন্তু মিলের চেয়ে গরমিলই বেশী দাদা!

হর্ষবর্ধন। কেন, গরমিল্‌টা কি দেখ্‌লি?

গোবর্ধন। ছাগলের ভাষা শিখতে দেরি লাগে না, ইস্কুলে না গিয়ে, ঘরে বসেই শেখা যায়, কিন্তু সাহেবদের ভাষা কত শক্ত!

হর্ষবর্ধন। শক্ত না ছাই! তোর মত ছাগলের কাছেই শক্ত। আমার কাছে জল!

গোবর্ধন। [চটে যায় এবার] জল তো বল্‌ছ! তাহলে বলো দেখি খুরির ইংরিজি?

হর্ষবর্ধন। কেন, বানান্‌ তো করেচি? কে এচ্‌ ইউ—

গোবর্ধন। বানান্‌ করা আর ইংরিজি করা এক হোলো?

হর্ষবর্ধন। পার্‌ব না বুঝি ইংরিজি করতে? পার্‌ব না নাকি? ...এমন কি শক্ত করা শুনি? এক্ষুনি করে' দিচ্ছি।

গোবর্ধন। করো আগে, দেখি তোমার বাহাদুরি!

হর্ষবর্ধন। [ভাবিতে ভাবিতে চীৎকার করিয়া ওঠেন] পেয়েছি! পেয়েছি ইংরিজি!

গোবর্ধন। কি শুনি? [তার মুখে সন্দেহের হাসি]

হর্ষবর্ধন। পেয়েছি! মানে, আরেকটু হলেই পেয়ে যাই। কথাটা পেটে এসেছে, মুখে এলেই হয়! মানুষের পিঠে সেই যে কী হয় বল্‌ তো, তাহলে এক্ষুনি আমি বলে' দিচ্ছি।

গোবর্ধন। মানুষের পিঠে? কোন্‌ পিঠে?

হর্ষবর্ধন। কটা করে' পিঠ মানুষের শুনি? আচ্ছা হাঁদা এক জুটেছে আমার কপালে!

গোবর্ধন। ও, তাই বলো, মানুষের অপর পিঠে। তাই বলো!

হর্ষবর্ধন। বল্‌ না কী হয় পিঠে? সেই অপর পিঠে—তাই বল্‌ না!

গোবর্ধন। পিঠে তো চুল হয় না। কারু কারু বুকে হাতে দেখেছি অবশ্যি।

হর্ষবর্ধন। যা হয় না তাই কি আমি জিজ্ঞেস করেছি?

গোবর্ধন। পিঠে তবে কী হয়? শিরদাঁড়া?

হর্ষবর্ধন। শিরদাঁড়া! সে তো হয়েই আছে। নতুন করে' আবার কি হবে? আহা, সেই যে, যা হলে পিঠ কেটে কেটে বাদ দিতে হয়, তবেই বাঁচে মানুষ। আবার প্রায়ই বাঁচে না।

গোবর্ধন। কুঁজ নাকি দাদা ?

হর্ষর্ধন। তোর মাথা! বাবা কি আর সাধে নাম দিয়েছিল গোবর্ধন। গোবর খালি মাথায়!

গোবর্ধন। কেন কুঁজেই তো হয় পিঠে। কুঁজ ছাড়া আর কি হবে? তুমি কি বলতে চাও গোদ্? গোদ্ হবে পিঠে? না, তোমার গলগণ্ড হবে?

হর্ষবর্ধন। আহা, সেই যে সনাতন খুড়োর যা হয়েছিল একবার। জেলার ডাক্তার এসে অপারেশন্ করল শেষে?

গোবর্ধন। ও? সেই কার্বাঙ্গল?

হর্ষবর্ধন। হ্যাঁ—হ্যাঁ! কার্বাঙ্কল্! এইবার পাওয়া গেছে! এইবার!—এবার কার্বাঙ্কল্ থেকে এল আঙ্কল্। আঙ্কল্ মানে খুড়ো—তাহলে খুড়ি মানে কি? বল্তো দেখি?

গোবর্ধন। আমি কি জানি! তুমিই তো বল্বে!

হর্ষবর্ধন। আহা, আমিই তো বল্ব! তুই বল্বি কোত্থেকে? তোর কি বিদ্যে আছে অতো? তাহলে তো আমি তোর দাদা না হয়ে তুইই আমার দাদা হয়ে যেতিস্! খুরির ইংরিজি হোল আণ্ট্। আণ্ট্ মা—নে খু—রি।

গোবর্ধন। জানতাম। তোমারি আগেই জানতাম। অনেক আগেই—হুঁ। আণ্ট্ নামে পিঁপড়েও হয় আবার।

হর্ষবর্ধন। হয়ই তো। আণ্ট্ তো দু'রকমের—এক পিঁপ্ড়েরা আর এক খুড়ি জেঠি। আমি বল্লুম বলেই জান্লি, নইলে তোকে আর জানতে হোতো না। আমার জানা আছে খুব।

গোবর্ধন। আচ্ছা, বেশ। আণ্ট্ বানান্ করো তো দেখি!

হর্ষবর্ধন। কেন? সোজাই তো বানান্! এ-এন্-টি আণ্ট্। এ-তে 'অ'-ও হয়, 'আ'-ও হয়। ইংরিজির মজাই তো ঐ!

গোবর্ধন। একারও হয় আবার।

হর্ষবর্ধন। আচ্ছা, সে-নাহয় হোলো! খুরি তো পাওয়া গেল। এখন মাখন কলের ইংরিজি পেলেই হয়ে যায়—সাহেবকে বুঝিয়ে খুঁজে বার করাই জিনিসটা। জানিস্ ওর ইংরিজি?

গোবর্ধন। মাখন কল? কলের ইংরিজি তো মিল্। যেমন পেপার মিল্—

হর্ষবর্ধন। যাঃ যাঃ! তোকে আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না! কলের ইংরিজি যে মিল্ সবাই তা জানে। যেমন ফ্লাওয়ার মিল্—তার মানে হচ্ছে ফুলের কল। যেমন ওয়াটার মিল—মানে জলের কল! এন্তার দেখতে পাবি পথে ঘাটে। যেখানে সেখানে—এই কলকাতারই রাস্তাতেই কল টেপ্ আর জল খা। এই জন্যে ট্যাপ্ কলও বলে কেউ কেউ! কিন্তু তাতো না, মাখনের ইংরিজি হোলো গিয়ে আসল! সেই মাখন আসছে কোত্থেকে?

গোবর্ধন। মাখন? মাখন—মাখন—মাখন—কি বলে গিয়ে—বাটার্ নয় তো দাদা?

হর্ষবর্ধন। বাটার্? বাটার্ কেন হবে? বাট্—বাটার্—বাটেস্ট। বাট মানে কিন্তু, তাহলে বাটার মানে হওয়া উচিত কিন্তু-কিন্তু। অর্থাৎ আরো বেশী কিন্তু। আমরা যেমন বলি না যে, লোকটা কিন্তু হয়ে গেল? তার ইংরিজি হবে, যে লোকটা বাটার্ মেরে গেল। তাছাড়া আর কি?

গোবর্ধন। [ঘাড় নেড়ে] উঁহু। আমার বেশ মনে পড়ছে বাটার্ মানেই মাখন। আর মাখন মানেই বাটার্।

হর্ষবর্ধন। [সন্দিগ্ধ নেত্রে] জানিস্ ঠিক? ঠিক মনে আছে তোর?

গোবর্ধন। হুবহু।

হর্ষবর্ধন। বাট্—বাটার্—বাটেস্ট। তাহলে, বাট্ মানে হোলো কিন্তু, বাটার্ মানে মাখন—আর বাটেস্ট? বাটেস্ট মানে

গোবর্ধন। কে জানে দাদা! তবে টেস্ট মানে তো চেখে দেখা, বাটেস্ট্ মানে মাখন চাখা নয় তো?

হর্ষবর্ধন। যাক্‌গে, যেতে দে! বাটেস্‌টে কাজ কি আমাদের। বাটার্‌ই যথেষ্ট। মাখন চেখে আর কাজ নেই এখন। আর এই কি তোর মাখন চাখবার সময়? কোনোরকমে এখন জিনিষটা কিনে নিয়ে ভালোয় ভালোয় ফিরে যেতে পারলেই বাঁচা যায়। তারপর খুড়োর ঘাড় ভেঙে, ঢের ঢের মাখন চাখা যাবে। তাহলে তুই বলছিস্, মাখন-কল মানে হোলো বাটার্ মিল। তাই তো?

গোবর্ধন। মিল আবার কবিতারও হয় দাদা! তবে কবিতার কলকারখানা হোলো গে আলাদা।

হর্ষবর্ধন। [ঈষৎ বিরক্ত হয়ে] তুই বড্ড বাজে বকিস্ গোব্‌রা! কি মিল্ আনতে কি মিল্ আনছিস্—কী সব এনে ফেল্‌ছিস্ বলতো?—সব গুলিয়ে দিচ্ছিস্ একেবারে। তাহলে—তাহলে—কী দাঁড়াল আসলে? মাখন কলের খুরি অর্থাৎ আণ্ট্ অফ্ এ বাটার্ মিল্—এই হয় না? তাহলে সাহেবকে গিয়ে এই কথাই বলা যাক্—কেমন?

বেয়ারা। [আসিয়া বলিল] বড়া সাব্ চেম্বার্ সে বাহার্ আঁতে হে, আপ্‌কো যো কুছ্ পুছ্‌না হ্যায় আভি পুছ্‌লিয়ে—ওহি আতেহেঁ—

[বড় সাহেবের আগমন]

বড় সাহেব। হোয়াট্ ডু ইউ ওয়াণ্ট্ বাবু?

হর্ষবর্ধন। ইয়েস্ সার্, উই ওয়াণ্ট্ সাম্ বাটার্—নো, নো, বাটার্ নট্—বাট্ বাটার্ অফ মিল্—মিল্ অফ আণ্ট্—য়্যান্‌ড্—আর কি বলা যায় গোব্‌রা?

গোবর্ধন। য়্যান্‌ড্—আণ্ট্ অফ বাটার্! ইট্ ইজ্ হ্যাট্ উই ওয়াণ্ট্!

বড় সাহেব। হোয়াট্‌—হোয়াট্‌?

হর্ষবর্ধন। উঁহু। ঘুরিয়ে বল্‌তে হবে—বুঝতে পারছে না সাহেব। নো সার্‌, উই—ওয়াণ্ট্‌—উই ওয়াণ্ট্‌ টু বাই—অফ্‌ কোর্স,—দি থিং ইজ্‌—বাটার্‌ অফ্‌ আণ্ট—আণ্ট্‌ অফ মিল্‌—মিল্‌ অফ্‌ বাটার্‌—বাট্‌ উই ডোণ্ট্‌ ওয়াণ্ট্‌ টু বাটেস্ট ইট্‌ হিয়ার্‌।

বড় সাহেব। কাণ্ট্‌ ফলো হোয়ট্‌ ইউ ফ্যালাজ্‌ ডু ওয়াণ্ট্‌। চাপ্‌রাসী, সম্‌ঝো, বাবু লোগ্‌ কেয়া মাংতা।

[সাহেব চলিয়া গেলেন]

হর্ষবর্ধন। ইস্‌! দেখেছিস্‌! কী হাঙ্গাম্‌! ইংরিজি কী বিচ্ছিরি ভাষা! আর জিনিষ কেনার কতো ল্যাঠা?

গোবর্ধন। বাজার করা সোজা নয় রে দাদা! বোঝানোই দায়! বোঝা আরো মুস্কিল! বোঝাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়।

বেয়ারা। আপ্‌ লোগ্‌ বাটার্‌-কাপ্‌ মাংতেহে কেয়া, নেহি আউর দোস্‌রা কুছ্‌? আপ্‌ লোগ্‌ যিস্‌কো খুরি বোল্‌তেঁহে উস্‌কোই কাপ্‌ বোল্‌তেঁহে সাহাব্‌ লোগ্‌।

হর্ষবর্ধন। কাপ্‌? কাপ্‌ কাহে? মাথামে যো পরতা হ্যায় উস্‌কোইতো কাপ্‌ বোলা যাতা! টুপি আউর কাপ্‌ একহি চীজ্‌ হ্যায়—হ্যায় কি না?

বেয়ারা। ওভি হো সক্‌তা—লেকিন্‌—

গোবর্ধন। [খাপ্‌পা হয়ে] লেকিন্‌ কেয়া? তুম্‌ লোক খুড়া সমঝ্‌তা আউর খুরি নেহি সমঝ্‌তা, এ কোন্‌ বাত্‌ হ্যায়?

হর্ষবর্ধন। সনাতন খুড়োর যেমন কাণ্ড! কলকাতায় খুরি কিনতে পাঠিয়েছে। খুরির জন্যে প্রাণে মারা পড়ি আর কি!

গোবর্ধন। [দারুণ অসন্তোষে] একটা বিয়ে করলেই তো পারে বাপু! খুরির আর দুঃখ থাকে না। তাকে ধরে মাখন কলেও লাগিয়ে রাখতে পারে দিন রাত!

হর্ষবর্ধন। যা বলেছিস্ গোব্‌রা! একটা কথার মত কথা বলেছিস্ এতক্ষণে।

গোবর্ধন। হ্যাঁ, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। একটা সনাতন খুরি হয়। খুরির দুঃখ ঘোচে আমাদের।

হর্ষবর্ধন। কিন্তু কি আশ্চর্য গোব্‌রা! আমি শুধু ভাবচি ব্যাটারা খুরি বোঝে না, আণ্ট্‌ও বোঝে না—কী তাহলে বোঝে বল্‌তো! এই বিদ্যে নিয়ে বিলেত থেকে ব্যবসা করতে এসেছে এখানে? অবাক্ কাণ্ড!

গোবর্ধন। কি করে' যে এরা দোকান চালায় খোদাই জানেন!

হর্ষবর্ধন। বড় সাহেবটা আসছে আবার। এদিকেই আসছে। দাঁড়া, ইংরিজিটা একটু গুছিয়ে নিই এবার—আমি তো ঠিকই বল্‌ব—এতক্ষণ বলেছিও ঠিক—কিন্তু ব্যাটাদের পেটে যা বিদ্যে, বুঝ্‌লে হয়!

গোবর্ধন। কিন্তু তোমার ইংরিজি বোঝাও একটু শক্ত দাদা! আমারই তাক্ লেগে যায়। বড্‌ডো শক্ত ইংরিজি তোমার।

হর্ষবর্ধন। হেড্ মাস্টারের মতো অনেকটা—কি বলিস্? তা সাহেবরা—সাহেবরাও কি বুঝতে পারে না? ওদের তো বোঝা উচিত।

বড় সাহেব। [ফিরিয়া আসিয়া] হ্যাভ্ ইউ গট্ ইয়োর্ থিং?

হর্ষবর্ধন। নো সার্! ইয়েস্ সার্!

বড় সাহেব। ক্যান্ ইউ এক্‌স্‌প্রেস্ ইট্ নাউ?

হর্ষবর্ধন। ক্যান্ ইউ হোয়াট্?

বড় সাহেব। এক্‌স্‌প্রেস্—আই মীন্—টেল্ ইট্ ক্লিয়ারলি—আই মীন্—টেল্ মি হোয়াট্ ইট্ ইজ্ ইউ ওয়াণ্ট্।

হর্ষবর্ধন। ইয়েস্ সার্। উই ওয়াণ্ট্ ইওর্ আণ্ট্—

বড় সাহেব। হো—য়া—ট্?

গোবর্ধন। ইওর্ আণ্ট্! নাথিং বাট্ ইওর্ আণ্ট্!

হর্ষবর্ধন। ইয়েস্ সার্। ইয়োর্ আণ্ট্ অফ্ এ বাটার্ মিল্! উই ওয়াণ্ট!

গোবর্ধন। উই ওয়াণ্ট্ ইওর্ আণ্ট্ অফ্ এ বাটার্ মিল্।

বড় সাহেব। [বজ্রগর্জনে ফাটিয়া পড়িলেন] ইউ ওয়াণ্ট্ মাই আণ্ট্! [সাহেবের মুখ থেকে চুরুট পড়িয়া যায়, দাঁত কড়মড় করে] মাই আণ্ট্? মাই ওন্ আণ্ট্? মাই ওন্‌লি আণ্ট্? ইজ্ দ্যাট্ হোয়াট্ ইউ ওয়াণ্ট্?

গোবর্ধন। ই—য়েস্ সার্—[কম্পিত কণ্ঠে বলে]

বড় সাহেব। [কোট্ খুলিয়া ফেলিয়া আস্তিন্ গুটাইতে থাকেন]। মাই ওন্ আণ্ট্—মাই ডিয়ার্‌লি বিলাভেড্ আণ্ট্—মাই ওন্‌লি য়্যাণ্ড্ লোন্‌লি আণ্ট্—ইউ ওয়াণ্ট্ হার্ টু বাই—?

গোবর্ধন। নো সার! আই—আই ডু নট্—হি—হী ওয়াণ্ট্স্ ইট্—[কাঁপতে থাকে]।

হর্ষবর্ধন। নট্ মি—নট্ মি—সার্—ইট্—ইজ্ আওয়ার সনাতন খুড়ো—আওয়ার ডিস্‌ট্যাণ্ট ভিলেজ্ অংকল্—ভেরি ব্যাড্ হি ইজ্—হি ওয়াণ্ট্স্ ইট্।

বড় সাহেব। ইয়োর আংকল্ ওয়াণ্ট্স্ মাই আণ্ট্—ও মাই গড্! মাই ওল্ড বিলাভেড্ আণ্ট্! দেন্ টেক্ ইট্!—টেক্ ইট্ হিয়ার্ য়্যাণ্ড্ নাউ!

[হর্ষবর্ধনের নাকের উপরে প্রচণ্ড এক ঘুষি ঝাড়িলেন। হর্ষবর্ধন ঘুষির ঠ্যালায় গোবর্ধনের ঘাড়ে গিয়া পড়িল, সেই ধাক্কাতেই সে কাৎ—তারপরে দুজনেই ভূমিসাৎ]।

গোবর্ধন। [হর্ষবর্ধনের তলায় চাপা পড়িয়া] ওরে দাদারে—!

হর্ষবর্ধন। গেছিরে ভায়া—!

যবনিকা

বেতন-নিবাৰক বিছানা

বেতন-নিবারক বিছানা

প্রথম দৃশ্য

মিহিরের মেস মিহির এবং স্থনীল চা-পান করিতেছে। স্থনীলের হাতে একখানা দৈনিক আনন্দবাজার—চা-পান করিবার ফাঁকে স্থনীল পড়িতেছে। সকাল বেলা।

মিহির। দূর্ ছাই! কিচ্ছু ভালো লাগ্‌ছে না! কবে থেকে বি-এ, পাশ করে' বসে আছি। অথচ চাকরির কোনো পাত্তাই নেই—

স্থনীল। কেন, আপাততঃ এই টুইশানিটা কর্ না কেন? ভালো টুইশানি বলেই তো বোধ হচ্ছে। আজকের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—পড়ছি শোন্ঃ

কর্ম্মখালি

কোনো বনেদি গৃহস্থের একমাত্র পুত্রের জন্য একজন বি-এ পাশ গৃহশিক্ষক আবশ্যক—আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া, বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা। আবেদন করুন।

মিহির। [শুনিয়াই লাফাইয়া উঠিল] কাদের এই করুণ আবেদন? এই তিরিশ টঙ্কার? ঠিকানাটা বল্‌তো।

স্থনীল। কাছেই তো রে! এমন বেশীদূর নয়। এই শ্যামবাজারেই। পোস্টবক্সের নম্বর নয়, বাড়ির ঠিকানাটাই দিয়েছে কাগজে। এই ছাখ্— [কাগজখানা দিল]

মিহির। [পড়িয়া, তখনই উঠিয়া দাঁড়াইল] আমি চল্লাম এখুনি।

স্থনীল। এমন ব্যস্ত কেন? এত তাড়াতাড়ি কিসের?

মিহির। না ভাই, চট্ করে যাই। বাগিয়ে ফেলিগে আগে। কি জানি, এতক্ষণে হয়তো দেড় হাজার টিউটর্ গিয়ে ভিড়ে গেছে! ভিড় ঠেলে ঢুকতেই পারব কিনা কে জানে!

সুনীল। তাহলে যা, আর দেরি করিস্‌নে।

মিহির। এই রকমেরই একটা সুযোগ খুঁজছিলাম ভাই! আপাততঃ এরকম একটা জুটলেও তো বেঁচে যাই। খাওয়া-থাকাটা অম্‌নিই হবে। তাছাড়া মাস মাস ত্রিশ টাকা—কিছু কিছু বাড়ীতেও পাঠাতে পারব। এম্‌-এ-টাও পড়া হবে, সেই সঙ্গে সিনেমা ফুটবল-ম্যাচ দেখার মত পকেট্‌-খরচারও অভাব হবে না।

সুনীল। তা, মন্দ কি নেহাৎ?

মিহির। [ট্রাঙ্ক খুলিয়া বি-এ পাশের সার্টিফিকেটখানা বাহির করিল] এটাও নিয়ে যাই, কি বলিস্‌? এটা আমার বি-এ পাশের সার্টিফিকেট—দেখতে চায় যদি।

সুনীল। না দেখতে চাইলেও, গায়ে পড়ে দেখিয়ে দিবি, ছাড়িস্‌নে। কিন্তু আমার একটা খট্‌কা লাগছে মিহির। এই বিজ্ঞাপনটা এর আগেও যেন আমি দেখেছি। এই আনন্দবাজারেই দেখেছি। প্রায়ই যেন দেখি এই বিজ্ঞাপনটা, বেশ মনে পড়ছে আমার।

মিহির। খুব সম্ভব ছেলেটি—ছাত্রটি একটি গবেট। প্রাইভেট টিউটর টিকতে পারে না তাই। বেতন ভারি দেখে এগোয় বটে, কিন্তু ছেলে আবার তার চেয়েও ভারি দেখে পিছিয়ে আসে।

সুনীল। তাই হবে হয়তো।

মিহির। আমি কিন্তু পেছোচ্ছি না বাবা! প্রাণপণে ছেলেটাকে পড়াব, পড়াতে গিয়ে যদি পাগল হয়ে যেতে হয় তবুও। ত্রিশ টাকা কম টাকা নয়, তার জন্যে গাধা পিটিয়ে মানুষ করা আর বেশি কি, মানুষ পিটিয়েও গাধা বানানো যায়। ভদ্রলোক অতগুলো টাকা কি মাগ্‌না দিচ্ছেন?

[সুনীল এবং মিহির বাহির হইয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মণ্টুদের বাড়ী

বাহিরের ঘরে বসিয়া মণ্টুর বাবা দৈনিক আনন্দবাজার দেখিতেছেন। মণ্টু প্রবেশ করিল।

মণ্টু। বাবা, আমার নতুন মাস্টার মশাই—

মণ্টুর বাবা। এসেছেন? এসেছেন? যা নিয়ায় এখানে।

[মণ্টুর প্রস্থান এবং মিহিরকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ]

মিহির। আজকের আনন্দবাজারে আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখেই আমি আসছি।

মণ্টুর বাবা। তা বেশ! বেশ ত! এসেছ ভালোই করেছ।

মিহির। বছর তিনেক হোলো আমি বি-এ পাশ করেছি। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাটা দেখবেন একবার?

[সার্টিফিকেটখানা পকেট হইতে বাহির করিতে গেল।]

মণ্টুর বাবা। থাক্ থাক্—সার্টিফিকেট দেখে আর কি হবে? ওসব তো মামুলি ব্যাপার। তার চেয়ে, তোমার শরীরটাই দেখি আগে। স্বাস্থ্যই হোলো গিয়ে আসল। স্বাস্থ্যই যার নেই সে আবার ছেলে কি পড়াবে? তোমাকেই দেখা আগে দরকার—তুমিই হচ্ছ তোমার সার্টিফিকেট।

মিহির। [আপ্যায়িত হইয়া] আজ্ঞে, যা বলেন আপনি—তা, আজ্ঞে, আমার স্বাস্থ্য নেহাৎ খারাপ নয়!

মণ্টুর বাবা। তোমার জামাটা একবার খোলো তাহলে।

মিহির। [একটু ইতস্ততঃ করে] জামাটা—গায়ের এই জামাটা—খুলতে বলছেন?

মণ্টুর বাবা। দাঁড়াও, আমার চশমাটা নিয়ে আসি ও-ঘর থেকে। [প্রস্থান

মিহির। তোমার বাবার খবর-কাগজ পড়তে চশমার দরকার হয়না, অথচ মাস্টার দেখবার বেলায়—

মণ্টু। আপনি জামা খুলতে ভয় খাচ্ছেন না কি সার্?

মিহির। না না, ভয় কিসের? ত্রিশ টাকার জন্যে জামা খোলা কেন, যদি জামাই হতে হয় তাতেও আমি রাজি!

[চশমা চোখে দিয়া মণ্টুর বাবার প্রবেশ—তিনি গম্ভীর মুখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিহিরকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

মণ্টুর বাবা। তুমি একসারসাইজ করো?

মিহির। তা, করি একটু-আধটু।

মণ্টুর বাবা। বেশ বেশ। কিন্তু তাহলে তো—

[বেশ একটু যেন ভাবিতেই দেখা যায় তাঁকে।]

মিহির। [ব্যায়ামের কথায় কর্তাকে ভাবিতে দেখিয়া] করতাম এক কালে, এখন আর করি না।

মণ্টুর বাবা। আরেকটা কথা জিগ্যেস করবো তোমায়—

মিহির। [সোৎসুক আগ্রহে] আমার সার্টিফিকেট দেখতে চাইছেন তো? দেখুন না! [নিজের পকেটে হাত পুরিয়া] বি-এ-তে আমি ডিস্টিঙ্কসন্ পেয়েছি। এই দেখুন—

মণ্টুর বাবা। না না, সার্টিফিকেট থাক,—তোমার ওজন কতো?

মিহির। ওজন? [আকাশ থেকে পড়ে] তা প্রায় দু'মণের কাছাকাছি।

মণ্টুর বাবা। বেশ বেশ। কিছুদিন তুমি টিক্‌তে পারবে আশা হয়। কি বলিস্ মণ্টু, তোর এ-মাস্টার মশাই কিছুদিন টিকে যাবেন, কি মনে হয় তোর?

মণ্টু। হাঁ বাবা। এ মাস্টার মশায়ের গায়ে অনেক রক্ত।

মণ্টুর বাবা। কিছুদিন টেঁকা ভালো, খুবই ভালো, বেশ সুখের কথাই, কিন্তু বেশ কিছুদিন টেঁকাটাই হোলো খারাপ। সেইটাই আশঙ্কার। যাক, সবই তো ভগবানের হাত—

মণ্টু। [বাধা দিয়া] ভগবানের হাত নয় বাবা, ছারপোকার—

মণ্টুর বাবা। চুপ্! কথার ওপর কথা ক'স্ কেন? এত বয়স হোলো, কিচ্ছু বুদ্ধিশুদ্ধি হোলো না তোর? হ্যাঁ, ছ্যাখো বাপু, পড়াশুনার সঙ্গে একটু এটিকেট্ও শেখাতে হবে ওকে। পিতামাতা গুরুজনদের কথার ওপর কথা বলা, অতিরিক্ত হাসা—এইসব মহৎ দোষ সারাতে হবে ওর। বেশ, আজ থেকেই তাহলে তুমি ভর্তি হলে। ত্রিশ টাকাই বেতন হোলো, মাসের পয়লা তারিখেই মাইনে পাবে, কিন্তু একটা সর্ত আছে। পুরো এক মাস না পড়ালে, এমন কি, একদিন কম হলেও একটা টাকাও তুমি পাবে না।

মিহির। যে আজ্ঞে।

মণ্টুর বাবা। পাঁচ-দশদিন পড়িয়ে অনেক প্রাইভেট টিউটর চলে গেছে। সে রকম হলে আমি বেতন দিতে পারি না, সেকথা কিন্তু আমি আগেই বলে রাখছি।

মণ্টু। কেবল একজন বাবা ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত ছিলেন, না বাবা? আরেকটা দিন কোনোরকমে যদি থাকতে পারতেন, তাহলে……কিন্তু কিছুতেই পারলেন না।

মণ্টুর বাবা। থাম! থাম্ তুই! সবই ভগবানের লীলা!

মণ্টু। ভগবানের নয় বাবা—ছার্—

মণ্টুর বাবা। চুপ্ কর্। তা তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এসো গে। আজ সন্ধ্যে থেকেই ওকে পড়াবে। মণ্টু, ছোট্টুলালকে ডাক্—

মণ্টু। ছোট্টুলাল। ও ছোট্টুলাল! ওহে বাপু ছোট্টুলাল!

[ছোট্টুলাল আসিল।]

ছোট্টুলাল। হামাকে বোলাচ্ছেন মালিক?

মণ্টুর বাবা। তা একটু বোলাচ্ছি বই কি! তুমি এতক্ষণ কি করছিলে? বাজারের পয়সা ফাঁক করে, আমার মাথায় হাত বোল্যাচ্ছিলে বুঝি?

ছোট্টুলাল। হামি কেন বোল্‌তে যাব হজুর? হামি কি হাপনাকে বোলাতে পারি?

মণ্টুর বাবা। তা কেন বোলাবে? তা না হয় না বোলালে। এখন যাও তো, মণ্টুর এই নতুন মাস্টারবাবুকে তাঁর ঘরটা দেখিয়ে দাওগে। শোবার ঘরটা। আর বুঝেছ, বেতন-নিবারকে – বেতন-নিবারক, বুঝেছ তো?

ছোট্টুলাল। বিতন নির্বাক? বুঝছি হুজুর, আর বোলতে হোবে না।

মণ্টুর বাবা। যাও, বেতন-নিবারকে মাস্টার মশায়ের বিছানাটা পেড়ে দাওগে।

তৃতীয় দৃশ্য

মণ্টুদের বাড়ীতে মিহিরের শোবার ঘর

ঘরের একধারে একখানা খাট, তাতেই মিহিরের শোবার বিছানা। চমৎকার গদি-দেওয়া, তার ওপর তোষক, তার ওপরে ধব্‌-ধব্‌ করছে সদ্য-পাট-ভাঙা বোম্বাই চাদর। ঘরের একধারে একটা ড্রেসিং-টেবিল—পুরণো, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। একটা ছোট বুক্‌কেসও আছে এক কোণে,—তার ওপরে বই-টই সাজানো। আরেক ধারে পড়াশোনার টেবিল, তার দু' পাশে দু'টো চেয়ার। ঘরের মধ্যে মিহির একা। দেয়াল-ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে আটটা।

মিহির। অদ্ভুত! অদ্ভুত! সত্যি ভারী অদ্ভুত! এই ত্রিশটি

টাকা! মাস গেলেই এই ত্রিশ টাকা পাওয়া। মাসের পয়লা তারিখেই পেয়ে যাওয়া! সত্যি ভারী বিস্ময়কর। য়্যাদ্দিন তো মাস গেলে টাকা দিয়ে এসেছি, দিয়েই এসেছি চিরকাল—একগোছা করে' টাকা—কলেজের টাকা, মেসের টাকা, খবরের কাগজওয়ালার টাকা—মাস কাবার মানে আমি সাবাড়! কিন্তু এবার, এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম আমি নিজে টাকা পাবো! মাস গেলেই পেয়ে যাবো। মাসের ঠিক পয়লা তারিখেই—বাঃ! বাঃ! বাহোবা!

[জিনিসপত্রের টুকিটাকি সাজাইতে গোছাইতে লাগিল।]

ঘরখানিও দিয়েছে বেশ! কেমন সাজানো-গোছানো পরিপাটি ঘর একখানা!—চমৎকার! ড্রেসিং-টেবিলটা পুরণো বটে, কিন্তু পরিষ্কার। একটা বুক্‌কেসও দিয়েছে আবার—এতেই আমার বইটই সব থাকবে।

[সেই বুক্‌কেসে নিজের বইগুলি সাজাইতে লাগিল।]

আর টেবিলের ধারে, এই চেয়ারটিতে বসে, হেলান্ দিয়ে দিব্যি আরামে আমি পড়াবো। বাঃ! বারে!

[টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া চেয়ারটায় একবার বসিয়া লইল]

আর ঐ খাটখানাই কী খাসা! কী চমৎকার গদি। তার ওপরে তোষক—তার ওপরে ধব্‌ধবে বোম্বাই চাদর বিছানো! কী তোফা বিছানা একখান্! সোনায় সোহাগা—গোদের ওপর বিষফোড়া যেন রে! সত্যি, ভারী ভদ্রলোক এরা—অতিশয় ভদ্রলোক! না, ভদ্রলোক নয়, কেবল ভদ্র বললে এদের অপমান করা হয়, এদের মানহানি হয়ে যায়—মহৎ—অত্যন্ত মহৎ—অতীব সদাশয়!

জীবনে কখনো গদিমোড়া খাটে গড়াই নি। এই ফাঁকে একটু শুয়ে নেয়া যাক্! সাড়ে আটটা বাজতে চলল, মণ্টু পড়তে

পড়তে আসছে না কেন? এখনও কি খেলাধুলা করে' ফেরেনি নাকি? না, আজ প্রথম দিনটায় পড়তে বসবে না? যাক্, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার কী—এখন খাটটায় একটু গড়িয়ে নিই—গড়াগড়ি দিয়ে নি খানিক্! একটু লম্বা হয়ে নি আগে!

[বিছানায় গিয়া শুইয়া—এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল]

আঃ, কী নরম! কী উপাদেয়! আজ খুব আরামে ঘুমানো যাবে। খেয়ে দেয়ে, আহারাদির হাঙ্গাম্ চুকিয়েই এসেছি—এখন মণ্টুটা এলে হয়! আজ আর বেশী পড়ানো নয়, একটু নমো নমো করে' পড়িয়েই ভাগিয়ে দেব—তারপর ঘুম! তোফা একখানা ঘুম! সেই কাল সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত!

[মণ্টু বই-পত্র নিয়া ঢুকিল]

মিহির। এসো, এই খাটে বসেই পড়াই তোমায়।

মণ্টু: না সার্, আমি ও-খাটে বসব না।

মিহির। [বিস্মিত হইয়া] কেন? এমন খাট্? এমন—

মণ্টু। [আম্তা আম্তা করিয়া] না, সেজন্যে নয়—আপনি মাস্টার মশাই, গুরুজন, আপনার বিছানায় কি পা ঠেকাতে আছে আমার? বাবা বারণ করেছেন।

মিহির। ওঃ, তাই! তাই বুঝি? তাহলে চলো, চেয়ারেই বসিগে।

[ক্ষুণ্ণমনে খাট ছাড়িয়া চেয়ারে গিয়া বসিল।]

কিন্তু যাই বলো, বেশ বিছানাটি কিন্তু তোমাদের! ভারী নরম। বেশ আরাম হবে ঘুমিয়ে। কই, দেখি তোমার বই।

[বই লইয়া]

Beans! বীন্স্ মানে জানো?

মণ্টু। [ঘাড় নাড়িয়া] না!

মিহির। Beans মানে বর্‌বটি। বর্‌বটি একরকমের সব্জী—তার তরকারি হয়। আমরা খাই। Beans দিয়ে একটা সেন্‌টেন্স করো দেখি। পারবে?

মণ্টু। [ঘাড় নাড়িয়া জানাইল] হ্যাঁ। [তারপর অনেক ভাবিয়া এবং আপন মনে অনেক ঘাড় নাড়িয়া] I had been there!

মিহির। [অত্যন্ত অবাক্] সে কি? সে আবার কি? উঃ, এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কেন তোমার মাস্টাররা টিকতে পারে না। কেন সবাই হুদ্দাড় করে পালিয়ে যায়। আচ্ছা, এই যে সেন্‌টেন্স্‌টা করলে, এর মানে কী হোলো?

মণ্টু। [সেও কম বিস্মিত নয়] মানে? কেন, এর মানে তো খুব সোজা। আপনি বুঝতে পারছেন না? এর মানে হচ্ছে সেখানে আমার বর্‌বটি ছিল। আই হ্যাড বীন্ দেয়ার—আমার ছিল বর্‌বটি সেখানে—সেইটাই ঘুরিয়ে ভালো বাংলায় হবে—'সেখানে আমার——'।

মিহির। থামো, থামো, আর ভালো করে' বোঝাতে হবে না তোমায়। 'আই হ্যাড্ বিন্ দেয়ার্' 'মানে আমি এখানে ছিলাম'। বুঝেছ?

মণ্টু। [আকাশ হইতে পড়িয়া] তবে যে আপনি বল্লেন বিন্ মানে বর্‌বটি? তাহলে আমি সেখানে বরবটি? তাহলে আমি সেখানে বর্‌বটি ছিলাম বলুন্!

মিহির। [সন্দিগ্ধভাবে] খুব সম্ভব তাই ছিলে তুমি। Been আর Bean কি এক হোলো? একটা বি, ডব্‌ল্ ই, এন্—আরেকটা বি-ই-এ-এন! বানানের তফাৎ দেখছ না? এ-been হোলো be ধাতুর form—

মণ্টু। [বাধা দিয়া] হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি স্যার—আর

বলতে হবে না আমাকে। অর্থাৎ কি না, এ-been হোলো মৌমাছির চেহারা। বি মানে মৌমাছি আর ফর্ম মানে চেহারা। আমি জানি।

মিহির। জানো তুমি? [বিস্ময়ে হতবাক্]।

মণ্টু। এই আজ সকালেই জেনেছি। আপনি তখন চলে গেলে বাবা বল্লেন কিনা, তোর নতুন মাস্টার মশায়ের বেশ ফর্ম—তখনই জেনে নিলাম।

মিহির। আমার চেহারা মৌমাছির মত? জানতাম না তো! কিন্তু সে কথা যাক্, যে-beans মানে বর্‌বটি তা দিয়ে সেন্‌টেন্স হবে এইরকম—'Peasants grow beans' অর্থাৎ 'চাষারা বর্‌বটি ফলায়।' অর্থাৎ, চাষারা বর্‌বটি উৎপন্ন করে, বর্‌বটির চাষ করে। বুঝলে?

মণ্টু। [ভয়ানক ভাবে ঘাড় নাড়ে] বুঝেছি!

মিহির। অমন করে ঘাড় নেড়ো না, ভেঙে যেতে পারে। তোমার তো আর মৌমাছির চেহারা নয় আমার মত। বেশ, বুঝেছ যদি, এইরকম আর একটা সেন্‌টেন্স বানাও দেখি বীন্‌স্ দিয়ে।

[মণ্টুর অনেকক্ষণ ধরে মুখ নড়ে, কিন্তু মুখ ফুটে বিশেষ কিছুই বার হয় না।]

মিহির। [হতাশ হইয়া] পারলে না? এই ধরো যেমন Our cook cooks beans, আমাদের ঠাকুর বর্‌বটি রাঁধে। এখানে তুমি কুক্ কথাটার দু'রকম ইউজ পাচ্ছ, একটা নাউন্, আরেকটা ভার্ব। আচ্ছা, আরেকটা সেন্‌টেন্স করো দেখি।

মণ্টু। By hook or crook।

মিহির। তার মানে?

মণ্টু। তার মানে? [একটু ভেবে] তার মানে আমি বলতে

পারব না—আপনি কুক্ দিয়ে একটা সেন্‌টেন্স কর্‌তে বল্লেন যে? তাই তো করলাম! করে’ দিলাম তাই তো!

মিহির। করে দিলে? বাই হুক্ অর্ ক্রুক্?—

মণ্টু। যদি আপনি মানে জান্‌তে চান্ তো বাবাকে জিগ্যেস্ করে আস্‌তে পারি। বাবা প্রায়ই বলেন কথাটা। জেনে আসবো।

মিহির। আমি তোমাকে বীন্‌স্ দিয়ে সেন্‌টেন্স করতে বল্লাম না?

মণ্টু। ও! বীন্‌স্ দিয়ে? বীন্‌স্! তা বল্লেই হয়। এতো খুব সোজা,—কত সোজা আরো। বীন্‌স্ দিয়ে? তাই বলছেন? বীন্‌স্—বীন্‌স্—এইযে! বলে দিচ্ছি! দাঁড়ান! We are all human beans!

মিহির। য়্যাঁ, বলো কি! আমরা সবাই মানুষ-বর্‌বটি! তাই নাকি হে?

মণ্টু। কেন, বাবাকে যে অনেকবার বলতে শুনেছি যে আমার হিউম্যান্ বিন্‌স্!

মিহির। ওঃ, এখন বুঝতে পারছি—

মণ্টু। কী বুঝতে পারছেন স্যার?

মিহির। বুঝতে পারছি কেন তোমার মাস্টাররা টেকে না—কেন তারা ফাঁক পেলেই পালিয়ে যায়।

মণ্টু। কেন সার্? বলুন না সার্?

মিহির। কেন আর? দিনের পর দিন—মাসের পর মাস এই তোমাকেই পড়াতে হবে তো? কি করে’ তাহলে টিক্‌বে? পড়াতে আসা—কুস্তি করতে তো আসা নয়।

মণ্টু। উঁহু, সেজন্যে নয়—সেজন্যে তারা পালায় না।

মিহির। রোজই দু’বেলা যদি এরকম ধ্বস্তাধ্বস্তি করে’ পড়াতে

হয় তাহলেই তো আমি গেছি। তাহলে তাহলে আমাকেও পালাতে হবে দেখ্‌ছি।

মণ্টু। আপনি—আপনিও পালাবেন?

মিহির। পালাবো না তো কি করব? পড়ে' পড়ে' তোমার মার খাবো নাকি? তাহলে আমিও টুইশানির মায়া ছেড়ে, ত্রিশ টাকার মায়া ছেড়ে, মাসের পয়লা তারিখের প্রলোভন ত্যাগ করে,' এমন কি, তোমাদের অমন নরম গদির মায়া কাটিয়ে—

মণ্টু। নরম গদি! যা বলেছেন সার্! মারাত্মক গদি! গদাও বলতে পারেন! বাবা তো গদাই বলেন।

মিহির। নাঃ, সেটি হচ্ছে না। কিছুতেই পালাচ্ছি নে। সে তুমি দেখে নিয়ো। একজন অবশ্যি উনত্রিশ পর্যন্ত টিকেছিল— আর একদিন টিক্‌তে পারলেই ত্রিশ টাকা পেয়ে যেত, ত্রিশ-ত্রিশটা টাকা পেত, কিন্তু একটি দিনের জন্য এক টাকাও পেল না। বেচারী! বোধ হয় তার পাগল হতেই বাকি ছিল কেবল—

মণ্টু। হ্যাঁ সার্, পাগল হয়ে যাবার ভয়েই পালিয়েছে।

মিহির। আর একটা দিন পড়াতে হলেই পাগল হয়ে যেত! কিম্বা পাগল হয়েই পালিয়ে গেছে কিনা তাইবা কে জানে!

মণ্টু। তাও হতে পারে।

মিহির। তাই সম্ভব। নইলে ত্রিশ-ত্রিশটা টাকা কোনো সুস্থ মানুষ ছেড়ে যায় কখনো?

মণ্টু। ছাড়তে পারে? আপনিই বলুন না?

মিহির। বলব কি? ভাবতেও আমার বুক কাঁপছে! হৃৎকম্প হচ্ছে আমার···কি সর্বনাশ!···

মণ্টু। কিন্তু কেন পালায় জানেন? বলব? আমাকে পড়াবার জন্যে নয়, সেজন্য নয় মোটেই। গদাঘাত সহ্য করতে পারে না বলেই পালায়!

মিহির। গদাঘাতই বটে। একখানি গদা-ই তুমি বটে! পড়াশোনায় গদাই লস্কর! আমি কিন্তু বাপু, চাক্‌রিও ছাড়ব না, পাগলও হব না, সে তুমি ঠিক জেনে রেখো। সে তুমি যাই বলো, পালাচ্ছিনে আমি। আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যা খুসি পড়ো, পড়ো চাই নাই পড়ো—বোঝো ভালো, না বোঝো নাই বোঝো—আমি কেবল বই খুলে পড়িয়ে যাব—এই মাত্র। তোমাকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাব না। আর মাথাই যদি না ঘামাই, পাগল হব কি করে'?

মণ্টু। হবেন, হবেন—ভয় নেই। হতেই হবে। পাগল না হয়ে আপনি পারবেন না। যা একখানা বেতন-নিবারক রয়েছে! না, আমি বলব না, বল্লে বাবা আমায় মারবে!

[মণ্টুর রহস্যময় হাসি]

মিহির। নাঃ, আমার কোন ভয় নেই। নির্বিকার ভাবে আমি পড়িয়ে যাবো।

মণ্টু। [হঠাৎ জিগ্যেস করে] আচ্ছা, বলুন তো সার্,—বলব? একটা কথা জিগ্যেস করব আপনাকে?

মিহির। করো, আমি তো নির্বিকার। নির্বিকার—নিরাসক্ত—নিস্পৃহ!

মণ্টু। বেতন-নিবারক বিছানা! এর ইংরিজি কী হবে সার্—জানেন?

মিহির। বেতন-নিবারক বিছানা! সে আবার কি?

মণ্টু। সে একটা জিনিস। বলুন না সার্, ইংরিজিটা জেনে রাখা দরকার।

মিহির। ওরকম কোনো জিনিষ হতেই পারে না।

মণ্টু। হতে পারে না কি, হয়ে রয়েছে। আপনি জানেন না তাহলে ওর ইংরিজি। সে কথা বলুন!

মিহির। ওর ইংরিজি হবে পে-সেভিং বেড্ [pay-saving bed]।

মণ্টু। [সন্দিগ্ধভাবে] উঁহু, হোলো না! হোলো না বোধ হয়। সেভিং মানে তো কামানো। ছোট্টুলাল আমাদের চাকর, সে বেতন-কামায়, বেতন-নিবারকে শোয় না তো সে। তাকে অনেকবার বলা হয়েছে—কিন্তু কিছুতেই সে শোয় না। এই জন্যেই তো এ-চাকরটা টিঁকে গেল আমাদের। বাবা ভারী দুঃখ করেন তাই।

মিহির। কী সব হেঁয়ালি বক্‌চো? তোমারও মাথা খারাপ নাকি? কেন, তোমাকে ত কাউকে পড়াতে হয় না—তোমার নিজেকে তো নয়ই। তবে? তবে কেন?

মণ্টু। আমার মাথা খারাপ? হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কি বেতন-নিবারকে শুই? বেতন-নিবারক! হাঃ হাঃ হাঃ!

মিহির। নাঃ, কিছু ভাব্‌ব না। তোমার মাথা খারাপ হোক্ চাই নাই হোক্। প্রতিজ্ঞাই করেছি, মোটেই আর মাথা ঘামাবো না তোমার ব্যাপারে। একবার ঘামাতে আরম্ভ করলে তখন আর থামাতে পারব না—পাগল হয়ে যাব নির্ঘাৎ। একজন উনত্রিশ দিন পর্যন্ত টিকেছিল—আর একটা দিন টিক্‌লেই—উঃ! করকরে ত্রিশ টাকা—

মণ্টু। ঠন্‌ঠনে তিরিশ!—মানে, ঠনাঠ্‌ঠন্ বাজিয়ে নিন্!

মিহির। যাও, শুতে যাও। আর পড়ানো নয়! অনেক পড়ানো গেল আজ। মাথা ঘেমে গেল। মাথা কেন, সারা গা-ই ঘেমে গেছে! আজ এই অব্দি থাক্। যাও ঘুমোও গে।

মণ্টু। [বই-পত্র লইয়া উঠিলে]। আপনিও ঘুমোন্ সার তাহলে।

মিহির। হ্যাঁ, ঘুমোব বই কি! ঘুমোতেই তো হবে। তোফা

একখানা ঘুম দিতে হবে এখন! চমৎকার এই নরম গদির বিছানায়! দু'-দু'বার আজ বৌবাজার আর বাগ্‌বাজার—কালীঘাট আর শ্যাম-বাজার করতে হয়েছে—অনেক হাঁটা-চলা গেছে,—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে! শুইগে!

[আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া আশ্রয় লইল]

মিহির। আঃ কী নরম!

[মিনিটখানেক চুপ্‌চাপ—তারপরেই ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদ শোনা গেল মিহিরের—মিহির তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ঝট্‌পট্ আলো জ্বালিল]

মিহির। য়্যাঁ, কিসে কাম্‌ড়ালো আমায়? সারা গায়ে হাজার হাজার ছুঁচ ফুটিয়ে দিল একসঙ্গে! কী ব্যাপার?

[আলো লইয়া বিছানার নিকটে গেল]

মিহির। ও বাবা! এ যে দেখছি ছারপোকা! সর্বনাশ! এ যে কাতারে কাতারে ছার্‌পোকা—সারা বিছানাতেই! হাজার হাজার, লাখ্‌লাখ্—গুণে শেষ করা যায় না! ছারপোকাই কেবল!

[বিছানা তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে থাকিল—]

য়্যাঁ! ধব্‌ধবে্ চাদরের তলায় একি ভয়াবহ আদর! নরম গদির ছলনায় একি নিষ্ঠুর গদাঘাত! বাঃ, আলো দেখে সব পালাতে সুরু করেছে। কুচ্‌কাওয়াজ্ করে, চলে যাচ্ছে সব—আধুনিক সৈন্যবাহিনীর মতই মার্চ করে' যাচ্ছে! যুদ্ধের কায়দা-কানুন্ সব এদের জানা দেখছি!

[দু'একটা মারিল]

মেরে কি হবে? একি আর মেরে শেষ করা যাবে? সমস্ত রাত ধরে' যদি ছারপোকাই মারবো তাহলে আর ঘুমোবো কখন্? নাঃ, চেয়ারে বসেই কাটাতে হোলো আজ রাতটা। আর আলো? না, আলো জ্বালিয়েই রাখতে হবে। নিভোলে, কী জানি,

যদি চেয়ারে এসে আমাকে আক্রমণ করে! যে রকম এরা লড়ুয়ে, বলা তো যায় না!

[চেয়ারে গিয়া বসিয়া—ভীতিবিহ্বল মুখে
বিছানার দিকে চাহিয়া রহিল]

উঃ, এতক্ষণে বেতন-নিবারক বিছানার মানে বুঝলাম। বুঝতে পারছি কেন মাস্টারেরা টেঁকে না! ও বাবা, কেবল ছাত্রই নয়, ছারপোকাও রয়েছে তার ওপর। ঘরে বাইরে যুদ্ধ করে' একটা লোক পারবে কেন! সামান্য একজন গ্র্যাজুয়েট বইতো না! তবু সে ভদ্রলোক উনত্রিশ দিন যুঝেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না—পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে পালাতে হোলো তাঁকে। য়্যানিমিয়া নিয়ে নিমতলার দিকেই কেটে পড়েছেন কিনা কে জানে! ত্রিশটাকা মাইনের মাস্টার রেখে বেতন না দিয়েই ছেলে পড়ানো—মাসের পর মাস মাস্টার বদ্‌লে—ইস্, আব্‌দার কম নয়! নাঃ, ভদ্রলোক কেবল উদার আর মহৎ নন্, বেশ রসিকও দেখছি! দারুণ রসিক!

চতুর্থ দৃশ্য

পরদিন সকাল

মন্টুদের বৈঠকখানা

মন্টুর বাবা আনন্দবাজার দেখিতেছেন।

মন্টু বসিয়া আছে।

[মিহির প্রবেশ করিল]

মন্টুর বাবা। এই যে বাপু, কেমন ঘুম হোলো রাত্রে?

মিহির। তোফা! অমন বিছানায় ঘুম হবে না, বলেন কি আপনি?

মন্টুর বাবা। [অবাক হইয়া] বেশ বেশ, ঘুম হলেই ভালো।

জীবনের বিলাসই হোলো গিয়ে ঘুম। তা, তোমার ঘুম বোধহয় একটু বেশি জমাট ? বেশ একটু জমাটি ?

মিহির। আজ্ঞে, সেকথা আর বলবেন না। একবার আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাশের বাড়ী চলে গেছলাম কিন্তু টের পাইনি একদম্।

মন্টুর বাবা। বলো কি হে ?

নিহির। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের বাড়ী বর্ধমান কিনা! শুনেছেন বোধহয় সেখানে বেজায় মশা—মশারি না খাটিয়ে শোবার যো নেই একদিন পাশের বাড়ীতে কী যেন দরকারে ডেকেছিল আমায়, কিন্তু ভুলে গেছলাম কথাটা, যখন শুতে যাচ্ছি তখন মনে পড়লো, কিন্তু তখন রাত হয়ে গেছে অনেক, অত রাত্রে কে যায়, আর দরজা-টরজা বন্ধ করে তারা সব শুয়ে পড়েছে তখন। আমি করলুম কি, সেদিন আর মশারি খাটালুম না। পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি পাশের বাড়িতেই আমি শুয়ে।

মন্টুর বাবা। [দারুণ বিস্মিত] কি রকম ? সে আবার কি রকম ?

মিহির। মশায় টেনে নিয়ে গেছল মশাই! সেইজন্যই তো রাত্রে মশারি খাটাই নি! অনায়াসে পাশের বাড়ী যাবার ওইটেই সহজ উপায় কি না সেখানে!

মন্টুর বাবা। [শুনে মুষড়ে পড়লেন] মশাতেই যখন কিছু করতে পারেনি তখন আর—তখন আর কিসে আর কি করবে তোমার! তুমি দেখছি টিকেই গ্যালে।

মিহির। আমার কিন্তু একটা নিবেদন আছে মশাই! কয়েকটা টাকা, আমার বেতনের থেকে, আগাম দিতে হবে আমাকে। ছারপোকার অর্ডার দেব।

মন্টু। ছারপোকা ?

মন্টুর বাবা। ছার্‌পোকার অর্ডার? কেন? সে আবার কি জন্য ?

মিহির। ও, আপনি জানেন না বুঝি? ছার্‌পোকার মত এমন মস্তিষ্কের উপকারী মেমারি বাড়ানোর মহৌষধ আর দুটি নেই। বিলেতে গিয়ে রীতিমত ছার্‌পোকার চাষ হয় এইজন্যে। গাধা ছেলে সব দেশেই তো আছে, কাজে লাগে তাদের।

মন্টুর বাবা। [সাগ্রহে] কি রকম—কি রকম? বিলেতে ছার্‌পোকার চাষ হয়? দাম দিয়ে কেনে লোক? আম্‌দানি-রপ্তানি হয়, তুমি জানো? আমি বেচ্‌তে পারি, হুম্—হাজার-হাজার, লাখ-লাখ—যতো চাও!

মিহির। বেচুন্ না! আমিই কিনে নেব। আমার নিজের কাজে লাগবে। ছারপোকার রক্ত ব্রেনের পক্ষে ভারী উপকারী। একটা ছার্‌পোকা ধরে' নিয়ে এম্‌নি করে' মাথায় টিপে মার্‌তে হয়, এইরকম হাজার—হাজার লাখ লাখ ছার্‌পোকার রক্তে এক ছটাক্ ব্রেন্।—বি-এ পাশের সময়ে আমি নিজেই পরীক্ষা করে' দেখেছি। সারা বছর ফাঁকি দিয়েছি, ফেল্ না হয়ে আর যাই নে। এমন সময়ে বিলিতি এক কাগজে ছার্‌পোকার উপকারিতা পড়া গেল—

মন্টুর বাবা। বিলিতি কাগজে ?

মিহির। বিলিতি কাগজেই তো! অম্‌নি সমস্ত মেস্ খুঁজে সবার বিছানা তন্ন তন্ন করে' যেখানে যা ছার্‌পোকা ছিল সব সদ্ব্যবহার কর্‌লুম। পরীক্ষা দেবার তখন মাত্র তিন দিন বাকী, তার পর ফল যা পেলুম নিজের চোখেই দেখুন না! আমার কাছেই আছে—বি-এ পাশ করলুম উইথ্ ডিস্টিঙ্কসন্—

[বুকপকেট হইতে সার্টিফিকেটখানা বাহির করিয়া মন্টুর বাবার মুখের উপর মেলিয়া ধরিল]

মণ্টুর বাবা। [বিস্ময়ে মুহ্যমান্]। তাইতো! সত্যিই তো! একটা কথাও মিথ্যে নয়—এইত লেখাই রয়েছে এখানে—Passed with Distinction—লেখাই রয়েছে বটে! এমন বস্তু ছারপোকা! কে জান্‌ত!

মিহির। সব্বাই জানে! বড় বড় ডাক্তাররা পর্যন্ত! কে না জানে? যারাই বিলিতি কাগজ পড়ে তারাই জানে।

মণ্টুর বাবা। যাক্, পয়সা খরচ করে' তোমাকে আর ছারপোকা কিন্‌তে হবে না। তোমার বিছানাতেই রয়েছে—হাজার হাজার লাখ লাখ—যতো চাও! তোমার ভয়ানক ঘুম বলে' তাই জানতে পারোনি।

মিহির। বলেন কি? এতক্ষণ তবে বলেন্ নি কেন আমায়? অনেকখানি ব্রেন্ করে' ফেলতুম তাহলে। কিন্তু এবেলা—এ বেলা যে আমার নেমন্তন্ন রয়েছে ভবানীপুরে। এখনই বেরুতে হবে যে! আচ্ছা থাক্ সন্ধ্যের মুখে ফিরে, সব আগে এগুলোর সদ্ব্যবহার করব! তারপর পড়াব মণ্টুকে।

[মিহির বাহির হইয়া গেল
মিহির চলিয়া গেলে, পিতাপুত্র মুখ
চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিলেন]

মণ্টুর বাবা। মণ্টু!

মণ্টু। কি বাবা?

মণ্টুর বাবা। ছারপোকার সঙ্গে ব্রেনের যে একটা সম্পর্ক আছে, খুব নিকট সম্পর্কই রয়েছে, অনেকদিন ধরেই কথাটা আমার মনে হয়েছে। ছারপোকার ব্রেনটাই একবার ভাব দিখি, সেটাই কিছু কম নাকি? ভাবলে অবাক্ হয়ে যাবি তুই।

মণ্টু। হ্যাঁ বাবা।

মণ্টুর বাবা। ছাখ্ না' খুচ করে' এসে তোকে কাম্‌ড়েছে,

তক্ষুনি উঠে দেশলাই জ্বেলে ছাখ্, আর তাকে দেখতে পাবিনে—কোথায় যে পালিয়েছে পাত্তা নেই তার। ধর্, মানুষ যে দেশলাই আবিষ্কার করেছে এই বৈজ্ঞানিক খবর অব্দি ওদের জানা! ভেবে ছাখ্ তো একবার।

মন্টু। হ্যাঁ, বাবা।

মন্টুর বাবা। এটা কি কম ব্রেন হোলো? তুইই বল্! আর এ-ব্রেন তো ওদের রক্তেই—কেন না ওদের তো আর মাথা নেই—মাথা আর কট্টুক্?—ওদের গায়েই ওদের ব্রেন্। হাড়ে-হাড়ে, উহুঁ—হাড়ও নেই ওদের—রক্তে-রক্তে ওদের বুদ্ধি। ঠিক বলেছে মিহির। তুই কি বলিস, মন্টু?

মন্টু। হ্যাঁ বাবা।

মন্টুর বাবা। তারপর ছারপোকার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধও বড় কম নয়। ছারপোকা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার বাড়ে। ট্রামে-বাসে-সিনেমায় যেমন ছারপোকা বেড়েছে তেমনি হু হু করে' খবরের কাগজের কাট্তিও বেড়ে গেছে। যায় নি কি? এই আনন্দবাজারই ছাখ্ না। আজকের নীট্ বিক্রয়-সংখ্যা এক লাখ পঁয়ষট্টী হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টী।

মন্টু। হ্যাঁ, বাবা!

মন্টুর বাবা। কেন, সেদিন দেখলিনে? বায়স্কোপে আমাদের চোখের সাম্নেই দশ আনার সীটে একটা কুলী বসেছিল তোর মনে নেই?

মন্টু। হ্যাঁ বাবা।

মন্টুর বাবা। সে ত লেখা-পড়া কিছুই জানে না। দু' মিনিট্ না বসতেই দশ পয়সা খরচ করে' একখানা আনন্দবাজার কিনে বসল। এতে শিক্ষার বিস্তার হোলো নাকি? মন্টু, তুই কি বলিস্?

মণ্টু। হ্যাঁ—বাবা।

মণ্টুর বাবা। চল্ তবে এক কাজ করি গে। তোর মাস্টার-মশাই ফেরবার আগে আমরাই ছারপোকাগুলোর সদ্ব্যবহার করে' ফেলিগে। ব্রেন তো তোরও দরকার—আর আমারও। আমার মেমরিটাও দিনকত থেকে যেন কমে আসছে। সেদিন শ্যামবাবুকে দেখে মনে হোলো গোবর্ধনবাবু আর গোবর্ধনবাবুকে দেখে মনে হোলো শ্যামবাবু, এতো খুব ভালো কথা নয়, কি বলিস্ মণ্টু? শ্যামবাবুর কাছে আমি টাকা পাই, আর এদিকে গোবর্ধনবাবু হোলে গে আমার পাওনাদার। কী ভয়ঙ্কর গোলমাল ভেবে ছ্যাখ্।

মণ্টু। হ্যাঁ বাবা।

পঞ্চম দৃশ্য

মণ্টুর পড়বার ঘর। সেই দিনেরই সন্ধ্যা। দেয়ালঘড়িতে আটটা। মণ্টু একা একা বসিয়া পড়াশোনা করিতেছে। মিহির প্রবেশ করিল।

মণ্টু। আপনার এত দেরী হোলো যে সার?

মিহির। বন্ধুর বাড়ীতে আটকে গেছলাম। সমস্ত ছুপুরটা ঘুমিয়ে—কী বলে গিয়ে যা খাট্‌নি গেছে আজ—

[জামা-কাপড় বদ্‌লাইল।]

মণ্টু। সারা ছুপুরটা ঘুমিয়েছেন বুঝি?

মিহির। না না, ঘুমুব কেন? কাল সমস্ত রাত অমন তোফা ঘুমোবার পর আবার কারু ঘুম পায় না কি? কী যে বলো! বল্লুম না, ভারী খাট্‌নি গেছে—বন্ধুর বাড়ী পেল্লায় এক ভোজ ছিল কিনা— [চেয়ারে গিয়া বসিল।]

মণ্টু। ও, তাই বলুন!

মিহির। বিশ্রী একটা গন্ধ পাচ্ছি যেন [মুখ বিকৃত করিয়া শুঁকিতে লাগিল]। কোত্থেকে একটা, কেমন যেন বীভৎস ভারী একটা দুর্গন্ধ আসছে না? মনে হচ্ছে খুব কাছেই যেন পাচ্ছি গন্ধটা—য়্যাঁ? এই যে, তোমার কাছ থেকেই না? নতুন ধরণের এসেন্স্-টেসেন্স্ মেখেছ নাকি কিছু? তোমার গা থেকেই আসছে যেন গন্ধটা।

মণ্টু। গা নয়, মাথা থেকে সার!

মিহির। কিসের গন্ধ?

মণ্টু। ছারপোকার।

মিহির। ছারপোকার? সে কি?

মণ্টু। আপনি চলে' যাবার পর বাবা আর আমি দু'জনে মিলে 'বেতন-নিবারকের' সমস্ত ছারপোকা শেষ করেছি। মেরে মেরে শেষ করেছি, আমাদের মাথাতেই টিপে টিপে মেরেছি।

মিহির। বলো কি, য়্যাঁ?

মণ্টু। হ্যাঁ সার! ছোট্টুলালকেও বলেছিলাম কিন্তু সে ব্যাটা মোটেই ব্রেন্ চায় না। বলে যে বরেন্ সে হামার কা হোবে? কিন্তু সার আর একটাও ছারপোকা নেই আপনার বিছানায়। হি হি হি—! [হাসিতে লাগিল]।

মিহির। য়্যাঁ?—

[সিংহনাদ করিয়া মিহির চেয়ার ছাড়িয়া এক লাফে বিছানায় গিয়া সটান্ হইল।]

মণ্টু। য়্যাঁ? [হতভম্ব হইয়া]। একি হোলো?

[মিহিরের চীৎকারে মণ্টুর বাবা ছুটিয়া আসিলেন। ছেট্টুলালও।]

মণ্টুর বাবা। কি হয়েছে রে মণ্টু, কী হোলো?

মণ্টু। ছারপোকা নেই শুনেই মাষ্টার মশাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

মণ্টুর বাবা। তা তুই বলতে গেলি কেন? শোকের প্রথম ধাক্কায় ওরকম হয়। ওরকমটা হয়েই থাকে। বারণ করলুম না তোকে? অতগুলো ছারপোকার মৃত্যুশোকের—পুত্রশোকের চেয়ে কম কি? কম কথা নয়তো!

মণ্টু। আমি কি করে জানব যে উনি অমন করবেন?

ছোট্টুলাল। মুখে জল ছিটাইলে উন্‌কোর গেয়ান্ হোতে পারে অভি—এখ্‌নোই গেয়ান্ হোয়ে যাবে।

মণ্টু। জল ছিটাব বাবা? আন্‌বো এক বাল্‌তি জল?

মিহির। (অজ্ঞান-অবস্থাতেই)। উঁহুঁ!

মণ্টুর বাবা। কাজ নেই বাপু! জ্ঞান হলে যদি কাম্‌ড়ে ছায় রাগের মাথায়? প্রথম শোকের ধাক্কাটা কেটে যাক আগে। এক-আধদিন অজ্ঞান হয়ে থাক্‌লেই কেটে যাবে ওটা। সময়ই হচ্ছে শোকের একমাত্র ওষুধ। কথায় বলে—টাইম ইজ দি বেস্‌ট্ হীলার—শুনিস্‌নি মণ্টু?

মণ্টু। হ্যাঁ, বাবা!

যবনিকা

মামা-ভাগ্নে

মামা-ভাগ্নে

মামা আর ভাগ্নে। ভাগ্নে একটা মোটা বইয়ের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ছিল। মামা প্রকাণ্ড একটা ভাঁড় হাতে ঘরে ঢুকলেন। ভাঁড়টা তাকের ওপর রেখে তাকালেন ভাগ্নের দিকে।

মামা। এই, এদিকে যেন নজর দিসনি। বুঝেছিস? [দিলও না ভাগ্নে। তার নজর ছিলো তখন বইয়েই।]

মামা। এই, সাড়া দিচ্ছিস না যে? এই বড়ো ভাঁড়টায় বাগবাজারের রসগোল্লা রইলো—দেখেছিস ভাঁড়টা?

ভাগ্নে। [এক পলক তাকিয়ে] তোমার ভাঁড়ে মা ভবানীই থাকুন, আর বাগবাজারই থাক, তাতে আমার কী?

মামা। তাই বলছি যে' ভুল করে যেন পেটে পুরিসনি। আমার বিকেলের জলখাবার। বুঝলি? অবশ্যি, আমার খাবার পরে তুইও একটু পাবি। তোকেও পেসাদ দেবো।

ভাগ্নে। তোমার পেসাদ আমার মাথায় থাক।

মামা। [প্রীত হয়ে] তা বটে, তা বটে! পেসাদ তো মাথায় করেই রাখার জিনিস। তা না হয় রাখলি, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু চাখলিও না হয়।

ভাগ্নে। বয়ে গেছে আমার।

মামা। বয়ে যে গেছিস তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বাজে বয়েই গেছিস, চোখের সামনেই দেখছি। বইটা কি শুনি।

ভাগ্নে। অভিধান।

মামা। অভিধান? অভিধান কি কেউ আবার পড়ে নাকি? অভিধান কি কোনো গল্পের বই?

ভাগ্নে। অভিধান পড়লে কতো শিক্ষা হয় তা জানো? কতো কথা শেখা যায়। আবার, একটা কথার কত রকম মানে, কত

কথার একরকমের মানে—জানা যায় সে-সব। লেখাপড়া শিখতে হলে অভিধান তোমার চাইই।

মামা। তোকে বলেছে? তবে হ্যাঁ, শুনেছি বটে, সেকালে লোকে ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখতো—

ভাগ্নে। এখন শেখে অভিধান দিয়ে।

মামা। তা শিখুকগে। মরুক গে! অভিধান নিয়েই থাক্ তুই? কথার মানে নিয়ে ধুয়ে খা। যত ইচ্ছা কথা গেল্, কিন্তু কথার মানে খুঁজতে গিয়ে আমার গোল্লা যেন গিলিস্-নে বাপু। হ্যাঁ, ভালো কথা, পাটনা থেকে আমার একটা ট্রাঙ্ককল্ আসবে—জানিস? এলেই আমায় বলবি, বুঝেছিস?

ভাগ্নে। আচ্ছা, আচ্ছা।

মামা। আমি ততক্ষণ ইজি-চেয়ারটায় একটু গড়িয়ে নিই, কেমন? যদি ঘুমিয়ে পড়ি, আর কল্‌টা তখন আসে তো আমায় জাগিয়ে দিবি। কেমন—বুঝেছিস?

ভাগ্নে। দেব গো দেব। তুমি ভেব না।

মামা। ভাবতে হচ্ছে বই কি। সেই কোন্ সকালে কনেকশন্ চেয়েছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত ট্রাঙ্ক-কলের পাত্তা নেই। [ইজি-চেয়ারে গা গড়িয়ে] এই, দরজাটা একটু ভেজা না? যা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। হাড় কাঁপিয়ে দিল যে। দরজাটা ভেজা।

[ভাগ্নে একটুও নড়ে না, বইয়েই মশ্‌গুল্।]

মামা। [গলা চড়িয়ে] কানে যাচ্ছে না বুঝি কথাটা? বলছি না দরজাটা ভেজাতে?

[ভাগ্নে বই রেখে উঠে যায়। এক বালতি জল এনে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দরজা ভেজাতে লাগে।]

মামা। এই, ও কী হচ্ছে ও? হচ্ছে কি?

ভাগ্নে। দরজা ভেজাচ্ছি। তুমি যে ভেজাতে বল্লে?

মামা। এই ছাখো, বল্লুম কী আর বুঝলো কী! আরে মুখ্যু, আমি কি তোকে জল দিয়ে দরজা ভেজাতে বলেছি? তাই বল্লুম নাকি? দরজাটাকে লাগাতেই তো বলেছি।

ভাগ্নে। তাই বলো! তা—বল্লেই হয়!

[কোণের থেকে মামার বেড়াবার লাঠিটা নিয়ে দরজায় সে কসে এক ঘা লাগায়]

মামা। আরে—আরে—করছিস কী?

ভাগ্নে। লাগাচ্ছি দরজাটাকে। তুমি যে বল্লে লাগাতে।

[দমাদ্দম্ পিটতে থাকে]

মামা। ভাঙলি? ভাঙলি তো লাঠিখানা? আমার সেগুন কাঠের সখের লাঠিটা! হায় হায়!

ভাগ্নে। চন্দন কাঠেরটা আছে এখনো। তাই দিয়ে লাগাবো নাকি? বলছো তুমি?

মামা। কী সব্বোনাশ! সেটা যে আরো দামী রে! ওসব লাঠি কি পাওয়া যায় আজকাল? এখানে তো নয়, ব্যাংগালোর থেকে আনানো। রক্ষে কর্ বাবা! তোর আর দরজা লাগিয়ে কাজ নেই।

ভাগ্নে। তুমিই বলছো লাগাতে আবার তুমিই বলছো—

মামা। আমি কি এম্নি লাগান্ লাগাতে বলেছি? আমি তো বলেছিলাম—

ভাগ্নে। কী বলছো, খোলোসা করেই বলো না? লাগাতে বলছো না ভেজাতে বলছো? একসঙ্গে ছুটো কাজ তো হয় না। কোন্টা করতে বলছো শুনি?

মামা। কিচ্ছু বলছিনে। বললেও তুই বুঝতে পারবিনে। ধান নিয়ে লেখাপড়া শিখলে যদি বা বুঝতিস, অভিধান দিয়ে—অভিধান যখন তোর মাথায় ঢুকেছে, এক কথার পাঁচ রকম মানে পাঁচ কথার

একরকম মানে—এসব কথার প্যাঁচে গিয়ে পড়েছিস তখন তোর মাথার ঘিলু বিলকুল ঘুলিয়ে গেছে। কথার মান-মর্যাদা কিছুই আর তোর কাছে নেই। মানে-অপমানে একাকার।

ভাগ্নে। বল্লেই হোলো! নিজেই সোজা করে বোঝাতে পারো না—কথা পাড়লেই হয় না।

মামা। আর পেড়ে কাজ নেই। কথার ডিম খালি অভিধানেই পাড়ে। পাড়তে পারে। আমার কম্মো নয়।

ভাগ্নে। এই গ্যাখো! তোমার ঘাড়েও অভিধানের ভূত চেপেছে মামা! সোজা কথার মধ্যে গোঁজামিল দিচ্ছো! কী পারতে কী পাড়ছো!

মামা। সঙ্গদোষেই বাপু, সঙ্গদোষে। তোর কুসঙ্গে পড়ে আমিও দেখছি বয়ে গেলাম। এইজন্যেই বলে কারো কোনো কথার মধ্যে থাকতে নেই। নাঃ, আর আমি তোর কথায় নেই—তোর কোনো কথাতেই না—এই আমি কানে আঙুল দিলুম।

ভাগ্নে। তাতে আরো বেশি শোনা যায়, বুঝলে মামা? আমি বলছি কী, তুমি যদি সোজা করে তোমার বক্তব্যটা বলো—দরজাটাকে তুমি কী করতে বলেছিলে?

মামা। কিচ্ছু করতে বলিনি—

ভাগ্নে। তাই বলো! আমিও তো সেই কথাই বলছি। দরজা তো কোনো কর্তব্যের মধ্যে না, দ্রষ্টব্যের মধ্যে। ঘরের শোভা। গোড়াতেই যদি এই সোজা কথাটা বলতে—সোজাসুজি বলতে—তাহলে আর এত গোল হোতো না!

মামা। হোতোই গোল। আমি যতো সোজা করেই বলি না, তুই উল্‌টো বুঝতিস। অভিধান গিলে খেতে গিয়ে অভিধানই তোকে গিলে খেয়েছে। কিছু আর বাকী রাখেনি তোর মগজের।

এখন আমি যদি তোকে বলি যে, মণ্টু, দরজাটা দে। তাহলে তো অমনি তুই দরজাটা খুলে এনে আমায় দিবি।

ভাগ্নে। আমার দায় পড়েছে। আমি কি ছুতোর মিস্তিরি? দরজা দেয়া কি আমার কম্মো? ইস্ক্রু-ডাইভার পাবো কোথায়? ছুতোরের যন্ত্রপাতি কই আমার?

মামা। নেই ভাগ্যিস্। থাকলে তো তুই দরজটা খুলে এনে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতিস। তাই না?

ভাগ্নে। অতো সোজা নয়! দাও বল্লেই দেয়া যায় না দরজা। গায়ে অতো জোর কই আমার। উৎসাহও নেই অতো। গরজ থাকে তুমি নিজেই গিয়ে নাও না। দরজা তো ঐ দাঁড়িয়েই আছে, পালিয়ে যাচ্ছে না কোথাও

মামা। থাক, আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। থার্মোফ্লাস্‌ক্ থেকে একটু চা ঢাল্ দেখি। কন্‌কনে হাওয়ায় জমে কুলপি বরফ হলুম। দরজা ভেজিয়ে কাজ নেই আর, গলা ভেজানো যাক। ফ্লাস্‌ক্ থেকে গরম চা ঢেলে দিতে পারবি এক পেয়ালা? না—কি—

ভাগ্নে। কেন পারব না? নাও না, খাও না!

[ফ্লাস্‌ক্ থেকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দিল মামাকে]

মামা। আঃ, বাঁচলাম! [চা খেতে খেতে] এই, আমি একটু ওঘর থেকে আসছি। তুই ততক্ষণ টেলিফোন আপিসে আমার ট্রাঙ্কের কী হোলো, খবরটা নে দেখি!

[মামার প্রস্থান—

ভাগ্নে। হ্যালো। টেলিফোন আপিস? ট্রাঙ্কের খবর কী?— জানতে চাইছেন আমার মামা।

[একটুক্ষণ ফোন ধরে থাকার পর]

অ্যাঁ, কী? হ্যালো? কি বল্লেন? সে কি, কোনো ট্রাঙ্কওয়ালার খবর আপনাদের জানা নেই? অ্যাঁ, কী বলছেন? আপনাদের

টেলিফোন গাইডের ক্লাসিফায়েড্ লিস্‌টে পাওয়া যাবে? কিম্বা, কোনো বড়ো ষ্টোরে ফোন করলেও পেতে পারি—তাই বলছেন? তা, ষ্টোরে কি কোথাও ট্রাঙ্কওয়ালাদের দয়া করে যদি আপনারাই একটু জানান।—জানাবেন? জানাচ্ছেন? ধন্যবাদ! প্রচুর ধন্যবাদ। আমাদের ঠিকানা? আমাদের ঠিকানা হচ্ছে নয়ের ছয় হাতীবাগান—[টেলিফোনের রিসিভার রাখতেই চায়ের পেয়ালা হাতে মামা এলেন।]

মামা। বেশ লাগলো চা-টা। আরেক পেয়ালা দে তো।

[ভাগ্নে আরেক পেয়ালা এগিয়ে দিলো।]

মামা। অ্যাঁ? আমি কি আরেকটা পেয়ালা চেয়েছি? খালি একটা পেয়ালা? চা চাইলাম না?

ভাগ্নে। চা চাচ্ছো তো চেঁচাচ্ছো কেন? পেয়ালা চেয়েছো দিলাম। চা চাও তা অকপটে বল্লেই হয়। বলতে হয়—আমায় চা-ভর্তি পেয়ালা দাও, কি পেয়ালা-ভর্তি চা দাও। তা না, আধখানা কথা পেটে আধখানা মুখে—

মামা। ইচ্ছে করছে এই পেয়ালা ছুঁড়ে মারি এক ঘা তোর মাথায়। মাথাটা দু'ফাঁক করে দেখি, সেখানে ঘিলু আছে, না, ঘুঁটে হয়ে গেছে এর সব মধ্যেই!

ভাগ্নে। [থার্মোফ্লাস্‌ক্ আর সবগুলি পেয়ালা এনে মামার সামনে রাখে]। এই নাও, খাও। ঢালো আর খাও। খাও আর ঢালো। যতো তোমার প্রাণ চায়। যতো খুসি।

মামা। যা, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

[ভাগ্নের প্রস্থান। নেপথ্যে মোটর গাড়ি থামার আওয়াজ।
ফিটফাট পোশাকে এক ভদ্রলোকের প্রবেশ।]

লোকটি। আপনিই কি ট্রাঙ্ক চেয়েছিলেন? টেলিফোন আপিস থেকে খবর দিয়েছে—

মামা। হ্যাঁ, আমিই। আপনি টেলিফোন আপিস থেকে আসছেন বুঝি? কখন্ চেয়েছি ট্রাঙ্কটা! কতক্ষণ হোলো! খুব জরুরি দরকার আমার—

লোকটি। তাই শুনেই তো ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম। তা, আপনার কি রকমের ট্রাঙ্ক চাই বলুন তো?

মামা। কি রকমের ট্রাঙ্ক—মানে? [একটু হতবাক]

ভদ্রলোক। মানে, কী সাইজের, কতো নম্বরের? কী রকম রঙ আপনার পছন্দ?

মামা। না, রঙ নম্বর আমার পছন্দ নয়। কোথাও না, কোনোখানেই না—কোনো রঙই আমার চাইনে।—না, কলকাতার কল-এ, না ট্রাঙ্ক কল্-এ—

ভদ্রলোক। তা'হলেও কেমন ধারা ট্রাঙ্ক আপনার চাই?

মামা। আমি তো গৌহাটির চেয়েছিলাম। তবে দিল্লীর থেকেও একটা ট্রাঙ্ক আসার কথা আছে বটে।

ভদ্রলোক। ইস্‌টিল ট্রাঙ্ক? হ্যাঁ, তাও আছে আমাদের কাছে। তাও পাবেন। কতো বড়ো, কি সাইজের, কেমনটি ডিজাইনের চাই আপনার বলুন?

মামা। ইস্‌টিল ট্রাঙ্ক? সে আবার কি?

ভদ্রলোক। মানে, কিরকমের—কতো সাইজের কেমনটি চাচ্ছেন—দয়া করে যদি জানান—কতো লম্বা—ক' ইঞ্চি চওড়া—

মামা। ভারী যে লম্বা-চওড়া কথা শোনাচ্ছেন? আপনারা কে মশাই, জানতে পারি একটু?

ভদ্রলোক। কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা ষ্টীল-ট্রাঙ্কওয়ালা আমরা, তা কি আপনি জানেন না! বেন্টিংক ষ্ট্রীটে আমাদের বিরাট ষ্টীল-ট্রাঙ্কের আড়ত। আমাদের কারখানার ট্রাঙ্ক যদি আপনি দেখেন—

মামা। ট্রাঙ্ক জাহান্নাম! ইস্‌টিল ট্রাঙ্ক নিকুচি করেছে! [চীৎকারে ফাটিয়া] কে চেয়েছে আপনাদের ইস্‌টিল ট্রাঙ্ক?

ভদ্রলোক। কেন আপনিই তো! একটু আগেই তো টেলিফোনে ডাকা হয়েছে আমাদের! আমাদের ট্রাঙ্ক নিয়ে পরখ করে দেখুন না একবার। যদি পছন্দ না হয় ফেরৎ দেবেন। এমন মজবুত ট্রাঙ্ক আর হয় না। সে বিষয়ে আমাদের গ্যারান্টি। আমাদের শোরুমে যদি দয়া করে একবার পায়ের ধূলো দেন তো আপনাকে আমরা দেখাতে পারি—

মামা। দেখতে চাইনি আপনাদের ট্রাঙ্ক। গোল্লায় যাক আপনাদের ট্রাঙ্ক জাহান্নামে যান আপনারা। যেখানে খুসি যান—

ভদ্রলোক। না কি সুটকেসই দরকার আপনার? তাও আছে আমাদের—হরেক রকমের—নানান সাইজের। দেখতে অতি সুদৃশ্য—

মামা। কোন দৃশ্যই দেখতে চাইনে আমি। আপনার নিজের দৃশ্যও নয়! দয়া করে আপনি আমায় একটু রেহাই দেবেন এখন?

[ভদ্রলোককে বিদায় দিয়া]

মণ্টু—মণ্টে—এই হতভাগা মণ্টে! তুই—

[ভাগ্নের প্রবেশ]

তুই—তুইও দূর হয়ে যা—ভাগ আমার সামনে থেকে!

ভাগ্নে। সাধ করে এমন ডাকাই কেন, আবার দূর করাই বা কেন? দিন দুপুরে এমন ডাকাতির মানে কী?

মামা। ডাকাতি! ডাকাতির মানে! ডাকাত কাঁহাকা! ইস্টুপিট—রাসকেল—বাঁদর! হতভাগা ভাগ হিঁয়াসে। নইলে—এক্ষুনি এক্ষুনি তোকে আমি খুন করবো। গুম্‌খুন করে বস্‌বো। উজবুক, উল্লুক, বেল্লিক! হিপোপটেমাস্‌। গোল্লায় যা তুই!

ভাগ্নে। কী বল্লে? কী বল্লে তুমি? আমায় গোল্লায় যেতে

বল্লে ? বেশ, তাই আমি যাচ্ছি। কিন্তু তারপর আর আমায় কোনো দোষ দিতে পারবে না। বলে রাখছি কিন্তু। [বলেই না সে একলাফে তাকের দিকে এগিয়ে রসগোল্লার ভাঁড়টি হাতে নেয়।]

মামা। এই—এই—কী হচ্ছে ! করছিস কী ?

ভাগ্নে। তুমি যা বল্লে তাই করছি। তোমার গোল্লার ভাঁড়—গোল্লার ভাঁড়ার ফাঁক করছি। [টপাটপ মুখে পুরতে থাকে]

মামা। [হতভম্ব হয়ে] ফাঁক করছিস ! আরে, আরে—সত্যিই তো ! সাবড়ে দিলি যে সব !

ভাগ্নে। তুমি গোল্লায় যেতে বল্লে যে ! কী করবো ? কিন্তু গোল্লার মধ্যে তো যাওয়া যায় না ! তাই—তাই গোল্লাই আমার মধ্যে যাক ! আহা, গোল্লায় যাওয়া—মানে, গোল্লাকে যাওয়ানো—কী ভালো !—

[গানের সুর]

—কী মিষ্টিই যে, আহা ! আহা রে !—
গোল্লা ছাড়া আমার কিছু রোচে নাকো আহারে

যবনিকা
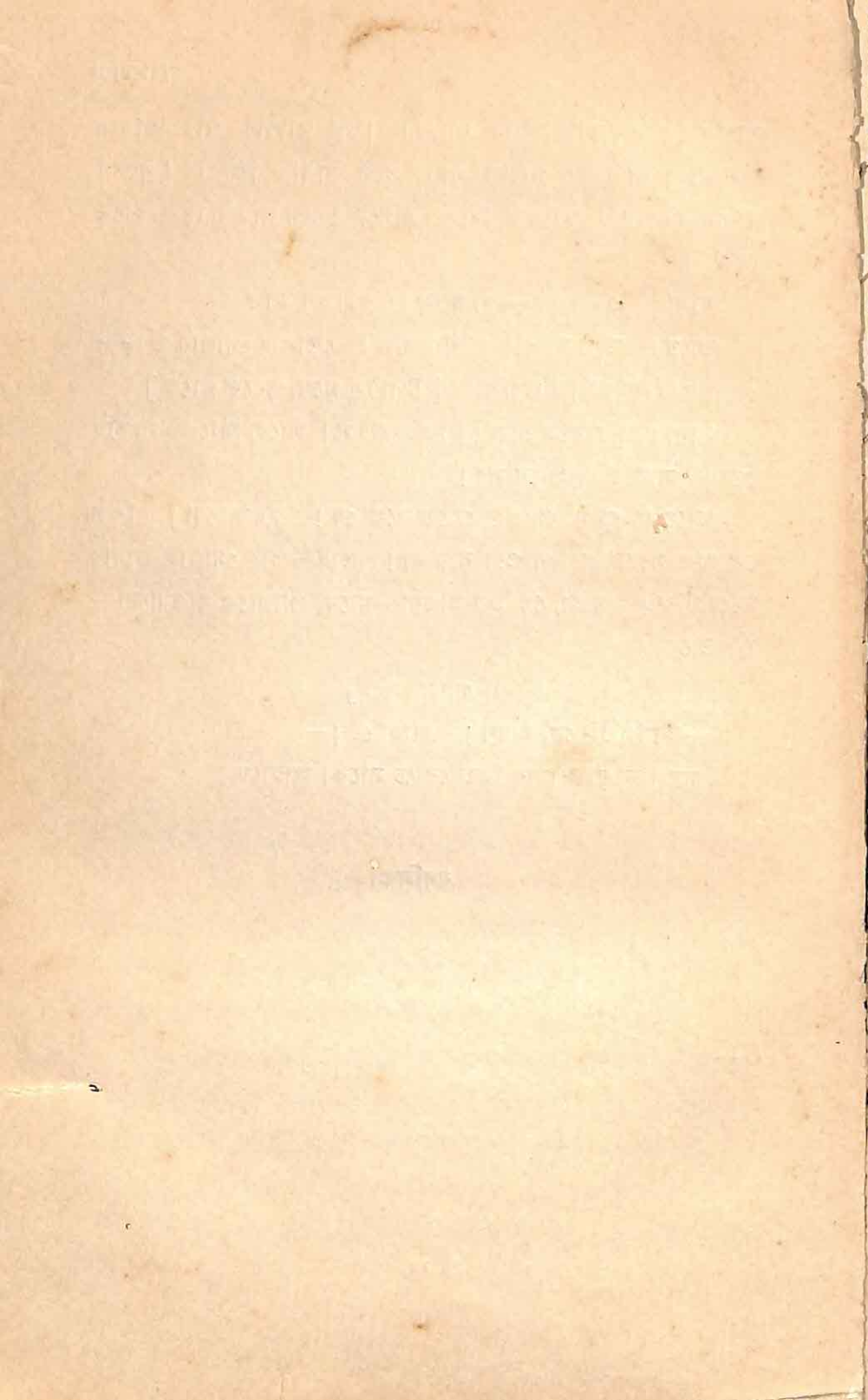
ভোজ বাজি
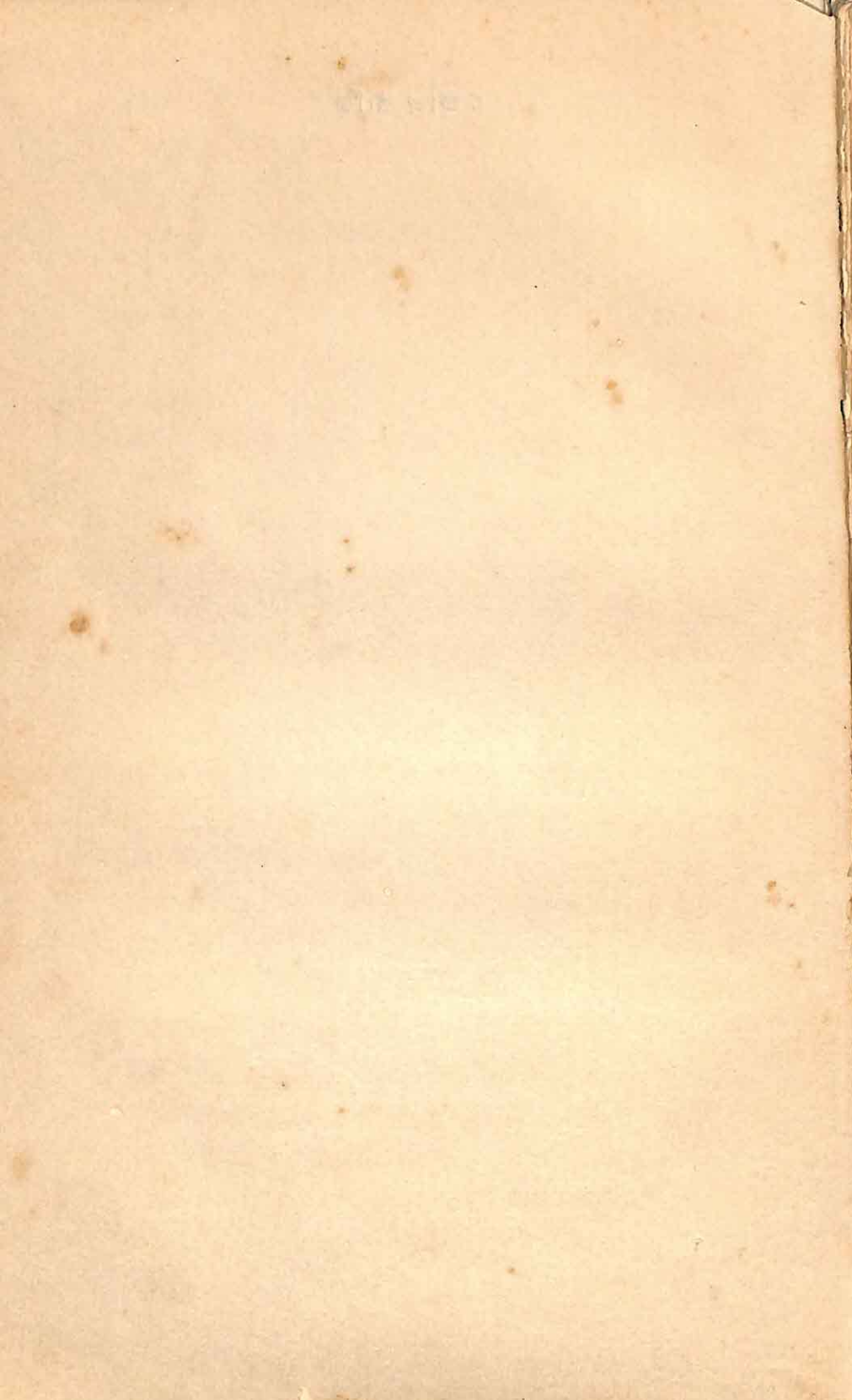
ভোজ বাজি

সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-বাড়ির একটি ঘর। কর্তা ও গিন্নি। কর্তা পথ পার্শ্ববর্তী জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কর্তা। আজ কালীপূজোর দিনটিতেই আকাশ মেঘলা করে এলো। বৃষ্টি-ফিষ্টি না হয় আবার! তাহলে তো পুজোর মজাইমাটি।

গিন্নি। তুমি কি এখন আবার বেরুবে নাকি?

কর্তা। জমিদার বাড়ির ঠাকুর দেখে—গাঁয়ের পূজোমণ্ডপ হয়ে ঘুরে আসতাম একবার। দেখি গিয়ে কেমন সব সাজিয়েছে—

গিন্নি। এই ঝড়বৃষ্টির মুখে তুমি বেরুবে?

কর্তা। ঝড় কোথায়? আকাশে একটু মেঘ করেছে মাত্র—যদি হয় তো পরে বৃষ্টি হতে পারে। এখন তো সবে সন্ধ্যে। সাতটা বেজেছে কেবল। আটটার মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।

গিন্নি। [জানালা দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে] ও বাবা, বেশ মেঘ করেছে। নামলো বলে' বৃষ্টি। আর বৃষ্টি এলেই ঝড় আসবে—ঝড়—বৃষ্টি—বিদ্যুৎ। না, তোমার আর এখন বেরিয়ে কাজ নেই।

কর্তা। কোথায় বৃষ্টি, কোথায় ঝড়, কোথায় বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ করেই চিরদিন তুমি গেলে। তোমার এই বজ্রাঘাতের ভয় কি কোনোদিন ঘুচবে না? বিদ্যুৎকে এত ভয় কেন তোমার? বিদ্যুৎচমককে ডরাবার কী আছে? বিশেষ করে তোমাদের মত মেয়েদের? [সুর করে আওড়ান]—

যে তড়িৎ খেলে ঐ আঁখিতে
প্রাণে মরি বুঝি প্রাণ থাকিতে—

গিন্নি। ইয়ার্কি রাখো। সব সময় ভাল লাগে না—

[নেপথ্যে আওয়াজ কড়—কড়—কড়াৎ—]

বন্ধ করো বন্ধ করো জানলা, দেখছো কি? কাছেই কোথাও বজ্রপাত হয়েছে নিশ্চয়!

কর্তা। মেঘ না চাইতেই জল! জল না আসতেই ঝড়। ঝড় না হতেই বজ্রাঘাত!

গিন্নি। বন্ধ করলে না? দাঁড়িয়ে রয়েছো এখনো?

[নিজেই তড়িৎগতিতে গিয়ে দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করতে লাগলো]।

গিন্নি। কী সর্বনেশে লোক বাবু তুমি। একটুও প্রাণের যদি ভয় থাকে!

কর্তা। প্রাণ-ভয়ে রয়েছি একটু সত্যিই। কিন্তু সে ভয় আমার বিদ্যুৎকে নয়—তোমাকে।

গিন্নি। ইস্! রস যে একেবারে উথলে উঠেছে। এই কি তোমার মস্করার সময়?

কর্তা। একি, আলোটা কমাচ্ছো কেন, উস্কে দাও। ঘর যে অন্ধকার করে ফেললে একেবারে। একি, নিবিয়ে দিলে যে বাতিটা?

গিন্নি। বজ্রপাতের সময় কি কেউ আলো জ্বালিয়ে রাখে? আকাশের বিদ্যুৎ যদি আলোর ইসারা পায়, সেই টানে নেমে আসে যদি—রক্ষে আছে তাহলে? লণ্ঠনের আলো যে বিদ্যুৎ টানে তা কি তুমি জানো না?

কর্তা। কী বিপদ অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে!

গিন্নি। দেখবে কী আবার? দেখবার কী আছে? যেখানে আছো, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, নোড়োনা—নড়োচোড়ো না। [কড়—কড়—কড়—কড়াৎ]

ওগো, কোথায়? তুমি আছো কোথায়?

কর্তা। যেখানে ছিলাম। কোথায়—ঘরের মধ্যিখানে লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

গিন্নি। ভাঙা খড়খড়িটার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের চমকানি

দেখলে? কদ্দিন বলেছি তোমায়, জানালাটা সারাতে—তা ছুতোর ডাকার ফুরসৎ হোলো না বাবুর! এখন বিদ্যুৎ যদি ফাঁক পেয়ে ঐ খড়খড়ি দিয়ে গলে আসে? হে মা কালী, হে মা দুর্গা, পূজো দেব মা, আজকের রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দাও। হে মা রক্ষে কালী! হে মা জগদম্বা!

কর্তা। তোমার বকুনি থামাবে?

গিন্নি। হে মা জগদ্ধাত্রী! হে মা বিন্ধ্যবাসিনী! [কড় কড় —কড়াৎ] শুনছো শুনছো, ওগো, হে মা আন্নাকালী।

কর্তা। হে মা কাজল কালি, হে মা দোয়াতের কালি!

গিন্নি। হে মা রক্ষাকালী, বাঁচাও মা! ওর কথায় অপরাধ নিয়োনা! ওর হয়ে আমি ঘাট মানছি। দোহাই মা! ওর যদি কোনো আক্কেল থাকে! হে বাবা মধুসূদন! [খড়খড়ির ফাঁকে আলোর ঝল্‌কানি]

ওগো, কোথায় তুমি রয়েছো!

কর্তা। কোথাও নেই!

গিন্নি। এই বাজ ডাকার সময় ঘরের মধ্যিখানে থাকা ঠিক নয়। তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমার পায়ে পড়ি, তক্তপোষের তলায় গিয়ে সেঁধোও।

কর্তা। তক্তপোষের তলায়?

গিন্নি। দাঁড়িয়ে আছো এখনো? এখনো সেঁধোওনি! ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো—

কর্তা। ভালো জ্বালা! (হঠাৎ আর্তনাদ) উঃ—

গিনি। ওগো, কী হলো গো?

কর্তা। কী আবার হবে! মাথায় লাগলো। তক্তপোষের ধারটা লাগলো মাথার খুলিতে—

গিন্নি। লাগতে দাও—সেঁধিয়েছো তো ওর তলায়—

কর্তা। চেষ্টায় আছি। ইস্! এর মধ্যে আবার তোরঙ্গটা ঢুকিয়েছো দেখছি। খোঁচা লেগে কনুইটা ছ্যাঁদা হয়ে গেল বোধ হয়।

গিন্নি। যাক গে কনুই, প্রাণে বাঁচো আগে। বেঁচে থাকলে অনেক কনুই হবে। অনেক পাবে—যতো কনুই চাও, যাক্, তোরঙ্গর পাশটিতে বসেছো তো?

কর্তা। বসিনি ঠিক। হামাগুড়ি দিয়ে আছি।

গিন্নি। হামাগুড়ি দিয়ে। কেন, হামাগুড়ি দিয়ে কেন? ঝড়বৃষ্টির সময়ে হামাগুড়ি দিয়ে থাকাটা কি ঠিক?

কর্তা। কে জানে। কিন্তু করব কি, তক্তপোষের তলায় যে বাবু হয়ে বসা যায় না।

গিন্নি। বসা যায় না। কী সর্বনাশ। বিদ্যুৎ চমকের সময় কি কেউ হামাগুড়ি দেয় নাকি? কেন, আসন-পিঁড়ি হয়ে বসতে পারছো না?

কর্তা। কি করে বসি, মাথায় লাগে যে। চৌকির ছাদটা লাগছে যে মাথায়।

গিন্নি। ভারী বিপদ বাধালে তো। এই সময়ে আবার চৌকি লাগছে মাথায়। এই কি তোমার মাথায় চৌকি লাগাবার সময় নাকি? বাজ পড়ার সময় যে ঘাড় সোজা করে রাখতে হয়—
[খড়খড়ির পথে আলোর চম্‌কানি—কড়-কড়-কড়াৎ-বুম্-বুম্-]

হে মা মনসা, হে মা শেতলা—কর্তার সুবুদ্ধি দাও মা—মাথা সোজা করে দাও। হামাগুড়ি দিয়ে কী সর্বনাশ যে ডেকে আনছেন—

কর্তা। চৌকি মাথায় করে বসে থাকবো আমার ঘাড়ের অতো জোর নেই। আমি ভীম-ভবানী নই। আমার দুগ্ধপোষ্য ঘাড়। তাই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে আছি।

গিন্নি। ঘাড় হেঁট করে আছো? তবেই মারা গিয়েছো আর আমাকেও মেরেছো। এই সময়ে মাথা সোজা করে রাখার নিয়ম

যে। চৌকির তলাতেই থাকতে হবে কিন্তু ঘাড় তুলে থাকা চাই—হায়, কি করি এখন আমি?

[কড়—কড়াৎ—বম্ বম্] দেখলে দেখলে তো। তোমার ঘাড় হেঁট করে থাকার জন্যে কী সর্বনাশটা হচ্ছে। নিজেও মরবে—আর আমাকেও মারবে। [কড়—কড়াৎ—ববম্]

হ্যাগো, উঠোনে ঘটিবাটি কিছু পড়ে নেই তো? পেতল কাঁসার বাসনে ভারী বিদ্যুৎ টানে—

কর্তা। দেখে আসবো গিয়ে? এখানে অধোবদনে বসে থাকার চেয়ে বরং বাইরে গিয়ে—

গিন্নি। বাইরে যাবে তুমি—এই বিপদের মুখে? কী আক্কেল তোমার বলো দেখি? তোমার চেয়ে ঘটিবাটি আমার বেশি আপনার? পেতল কাঁসার দামটাই বেশি হোলো? ঘাড় সোজা করেছো?

কর্তা। [চৌকির বাইরে এসে] করেছি। এতক্ষণে করতে পেরেছি। আহা, ঘাড়ের বোঝা নামলো, নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বাঁচলাম।

গিন্নি। একি, এখন ফের ফস ফস করে কি ঘষতে সুরু করলে?

কর্তা। দেশলাই জ্বালছি, সিগ্রেট ধরাবো।

গিন্নি। কী সর্বনাশ! এই সময়ে কেউ আলো জ্বালে? সিগ্রেট ধরায়? সিগ্রেট খাবার সময় এই? আলোয় যেমন বিদ্যুৎ টেনে আনে এমন আর কিছুতে না। এই প্রাণ নিয়ে টানাটানির সময় তোমার কি সিগ্রেট না টানলেই নয়? [কড়—কড়াৎ—বম্ বম্—আলোয় ঝলকানি]

দেখলে—দেখলে তো, কী করলে তুমি।

কর্তা। আমি কি করবো। ও তো আপনি হচ্ছে। দেশলায়ে

বিদ্যুৎ টেনে আনে কি না তা তুমিই জানো। হয়তো টানে, কিন্তু পয়দা করতে পারে না বোধ হয়।

গিন্নি। এই কি তোমার বক্তৃতা করার সময়? এখন কোথায় সেই সপ্তবজ্র নিবারণের মন্তর আওড়াবে, না তক্কো করতে লেগেছো। বলি, সেই মন্তরটা আওড়াবে একবার?

কর্তা। কি মন্তর? কিসের মন্তর?

গিন্নি। সপ্তবজ্র নিবারণের। অশ্বত্থামা বলিব্যাস হনুমন্ত বিভীষণো। কৃপাচার্য—দ্রোণাচার্য সপ্তবজ্র নিবারণো।

কর্তা। হনুমান—জাম্বুবান—বলিব্যাস বিভীষণো। কৃপাচার্য—দ্রোণাচার্য—ও বাবা, এখানে আবার কী এটা? কার যেন ল্যাজে পা পড়লো! দেখি হাত দিয়ে, ওমা ল্যাজই তো।

গিন্নি। ল্যাজ?

কর্তা। হনুমানের কি না কে জানে! অন্ধকারের তো ঠাওরাবার যো নেই! পা ছড়াতে গিয়ে ঠেকেছে। মনে হচ্ছে তোমার মন্তরের চোটে হয়তো বাবা হনুমানের আবির্ভাব হয়েছে।

[ল্যাজটার আওয়াজ : ম্যাও—ম্যাও—মিয়াও]

গিন্নি। এই কি তোমার আমোদের সময় গো? ফুর্তি করে বেড়াল ডাকা হচ্ছে আবার?

কর্তা। আমি কোথায় ডাকলাম!

গিন্নি। তবে কে ডাকলো, কে ডাকতে গেল সখ করে? ওপাড়ার বট্‌ঠাকুর?

কর্তা। ম্যাও যার ভাষা, সেই বেড়াল নিজেই।

গিন্নি। অ্যাঁ? বেড়াল? বেড়াল রয়েছে নাকি ঘরে? তাহলে আর আমাদের রক্ষে নেই। বেড়াল ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ টানে। বেড়ালের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিদ্যুৎ, বইয়েতেই লিখে দিয়েছে।

কী সর্বনাশ! হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে মা অশ্বত্থামা—বলিব্যাস—

কর্তা। মা নয়, বাবা। বাবা নয়, বাবারা। পুংলিঙ্গে বহুবচন হবে যে! ব্যাকরণে ভুল কোরো না গিন্নি! এই দুঃসময়ে দেবতারা চট্‌তে পারেন!

গিন্নি। এই সময়ে তোমার ইয়ার্কি! দেবতাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা? হে হনুমন্ত বাবা, হে বাবা বিভীষণ। কর্তাকে রক্ষা করো! তোমাদের অবোধ সন্তানের অপরাধ নিয়ো না বাবারা!

[কড় কড় কড়াৎ বম্‌বম্ ববম্‌বম্]

তুমি কি এখনো বেড়ালের ল্যাজ ধরে বসে আছো নাকি? দাও দাও হটিয়ে দাও—হটিয়ে দাও ওটাকে।

কর্তা। কি করে হটাবো? খুঁজে পাচ্ছি না যে। ল্যাজ নিয়ে কোথায় যে সট্‌কালো হতভাগা।

গিন্নি। আশেপাশেই নিশ্চয় কোথাও আছে। তুমি আর তাহলে মেজেয় বসে থেকো না। বেড়ালের আওতার বাইরে থাকতে হবে। এক কাজ করো তুমি। তক্তপোষের পাশে যে তেপায়াটা আছে, তার ওপরে উঠে দাঁড়াও। কাঠের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না। চেয়ার কিম্বা টেবিলের ওপরে দাঁড়ানোই এখন সবচেয়ে নিরাপদ। দাঁড়িয়েছো?

কর্তা। উঁহু।

[ফ্যাশ্—কড়—কড়াৎ—কড়াক্কড় ববম্—বম্ বম্ বম্]

গিন্নি। কী সর্বনেশে মানুষ বাবা তুমি! দাঁড়াওনি? এখনো দাঁড়াওনি? তুমি কি আমায় পাগল করবে? সবংশে না মেরে ছাড়বে না আমাদের? ওগো তোমার দুটি পায় পড়ি গো—

কর্তা। দাঁড়িয়েছি বাপু, দাঁড়িয়েছি। হোলো? হয়েছে?

গিন্নি। এই দুর্যোগের রাত কাটলে হয়! দোহাই মা কালী!

ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দাও মা! যদি বেঁচে থাকি তো কাল সকালেই তোমায় স-পাঁচ সিকের পূজো দেবো মা।

[নেপথ্যে থেকে জানালায় করাঘাত।] কর্তামশাই বাড়ী আছেন?

কর্তা। তারিণীবাবুর গলা না? এই দুর্যোগেও উনি বেড়াতে বেরিয়েছেন দেখছি। ঝড়বিষ্টি বিদ্যুতের পরোয়া না করেই। বাড়িতে বৌ নেই তো, তাই খোদার খাসির মতো খাসা চরে বেড়াচ্ছেন!

তারিণীবাবু। [নেপথ্যে থেকে] জানালাটা একবার খুলুন না মশাই, একটা কথা বলে যাই।

গিন্নি। তোমায় যেতে হবে না—এই দুর্যোগে জানালা খুলতে। যেমন আছো, চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো। ওঁর কি? ওঁর তো বিধবা হবার কেউ নেই।

[বাহির থেকে একটু টানতেই আল্‌গা জানালা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে তারিণীবাবুর লণ্ঠনের আলো পড়তেই কর্তাকে টিপয়ের উপর আর গিন্নিকে ঘরের কোণে খাড়া দেখা গেল]

তারিণীবাবু। এ কি, আপনি ঐভাবে দাঁড়িয়ে কেন? কি হয়েছে? তেপায়ার ওপর ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে দাঁড়িয়ে যে? কী ব্যাপার?

কর্তা। আকাশে বিদ্যুৎ হানছে কিনা! দারুণ ঝড় বিষ্টি— তাই বাজ পড়ার হাত থেকে বাঁচতে—

তারিণী। কোথায় ঝড় বিষ্টি? একটুখানি মেঘ করেছিলো— সে তো কেটে গেছে অনেকক্ষণ।

কর্তা। তবে যে ঐ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বাজ ডাকছিল যে?

তারিণী। ওহো, সে আমাদের জমিদার বাবুর বাড়ি কালীপূজো কিনা, তাই। ফি বছরই তো সেখানে জোড়া পাঁঠা বলি হয়, পাড়া

শুদ্ধ সবাই পেসাদ পায়। কিন্তু তাঁদের পাঁঠাবলি বন্ধ যে এবার !

কর্তা। কেন ? বন্ধ কেন ?

তারিণী। জমিদারবাবুর সবগুলো দাঁতই পড়ে গেছে তো! এ বছর তাই বুড়ো কর্তা বললেন যে এবারে আর পাঁঠা বলি দিয়ে কী হবে, জীবহত্যায় কাজ নেই! তার চেয়ে বরং ঐ টাকায় কলকাতার থেকে বাজি কিনে আনা যাক্! এতক্ষণ সেই বাজি পোড়ানো হচ্ছিল কিনা।

কর্তা। তারই এত ধূমধাড়াক্কা ? বটে ? আর আমরা এখানে ভয়ে মরছি। যাক্‌গে, তা পাড়ার লোকের পেসাদ পাওয়ার কী হবে। ভোজের ব্যাপারটা তাহলে ?

তারিণী। ঐ যে বাজি হোলো। তাতেই ভোজবাজি হয়ে গেল সব।

যবনিকা

তোতলামি সারানোর ইস্কুল

তোতলামি সারানোর ইস্কুল

পথ। দুই বন্ধু, হিরণ্ময় ও হিরণ্যাক্ষ।

হিরণ্ময়। শুনেচিস, আমাদের নিরঞ্জন নাকি বিয়ে করেছে?

হিরণ্যাক্ষ। পরোপকারী নিরঞ্জন?

হিরণ্ময়। শ্বশুর খুব বড়লোক। শ্বশুরের টাকায় ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাবে নাকি?

হিরণ্যাক্ষ। বলিস্ কিরে? নিরঞ্জন তাহলে অ্যাদ্দিনে কি নিজেকে পর বলে বিবেচনা করতে পেরেচে? তা না হ'লে নিজেকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত পাঠাচ্ছে কি করে? নিজেকে পর বলে ভাবতে না পারলে নিজের প্রতি এতখানি পরোপকার করা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

হিরণ্ময়। বাঁচা যায় তাহলে। ওর পরোপকারের খর্পর থেকে আমরা বাঁচি।

হিরণ্যাক্ষ। ইস্কুলে পড়ার সময় কী জ্বালানটাই না জ্বালিয়েছে। তোর মনে আছে, সেইবার—সেই ফুটবল ম্যাচ্ জিতে ফেরার সময়। তেষ্টায় প্রাণ যাচ্ছে, সামনে লেমনেডের ঝুড়ি, ও কিন্তু কিছুতেই দেবে না জল খেতে। বলচে এত দৌড়ঝাঁপের পর জল খেলে সর্দিগর্মি হবে। হার্ট ফেল করতেও পারে।

হিরণ্ময়। মনে আছে বই কি। আমরা যতো বলি, করে করুক, আমাদের হার্ট, তোমার কি। ও ততই বলে, আহা মারা যাবে যে!

হিরণ্যাক্ষ। যতই বলি যে জল না খেলেও যে মারা যাবো, তা দেখচ না। ও ততই বলে, সেও ভালো, তা বলে হার্ট ফেল করে কি সর্দিগর্মি হয়ে তোমাদের মরতে দিতে পারি না। দিল্ না জল খেতে।

হিরণ্ময়। সেদিন কি ইচ্ছে হয়েছিল জানিস? ইচ্ছে হয়েছিল

যে আরেকবার ম্যাচ্ খেলা সুরু করি—নিরঞ্জনকেই ফুটবল বানিয়ে। কিম্বা ওকে ক্রিকেটের বল ভেবে নিয়ে লেমনেডের বোতলগুলোকে ব্যাটের মতন কাজে লাগাই।

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

হিরণ্যাক্ষ। এই যে নিরঞ্জন। তোমার কথাই হচ্ছিল। বলি চুপি চুপি বিয়েটা সারলে, একবার খবরও দিলে না বন্ধুদের। জানি, আমাদের ভালোর জন্যই খবর দাওনি। অনেক কিছু ভালোমন্দ খেয়ে পাছে পেটের অসুখে মারা পড়ি—সেই কারণেই কাউকে জানাওনি। কিন্তু না হয় কিছু নাই খেতাম আমরা, বিয়েটাই দেখতাম কেবল! বৌ দেখলে কানা হয়ে যেতাম না নিশ্চয়?

নিরঞ্জন। কী যে বলো। বিয়েই হোলো না তো বিয়ের খাওয়া।

হিরণ্ময়। তবে যে শুনলাম বিয়ে করে বড়লোক শ্বশুরের টাকায় ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাচ্ছো?

নিরঞ্জন। বাজে কথা। ভুলেও নিজের উপকার করবো তোমরা তাই ভেবেছ আমাকে? পাগল! ভাবছি তোতলাদের জন্যে একটা ইস্কুল খুলব। মূক-বধির বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তোতলাদের জন্য তো কিছু নেই। অথচ কী সম্ভাবনাই না রয়েছে তাদের মধ্যে।

হিরণ্যাক্ষ। কি রকম?

নিরঞ্জন। জানো না। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস্ আসলে কী ছিলেন। তোতলাই তো। মুখে মার্বেল গুলি রাখার প্র্যাক্‌টিস্ করে নিজের তোতলামি সারিয়ে ফেললেন। অবশেষে, তিনি এত বড় বক্তা হলেন যে, অমন বক্তা পৃথিবী কখনো ছ্যাখেনি। সেটা সেই মার্বেল গুলির কল্যাণেই কিম্বা তোতলা ছিলেন বলেই —কিসে যে হোলো তা আমি বলতে পারব না।

হিরণ্যাক্ষ। বোধ হয়—ওই দুই কারণেই।

নিরঞ্জন। আমারো তাই মনে হয়। আমিও স্থির করেছি বাংলাদেশের তোতলাদের সব ডিমস্থিনিস্ বানাবো। তোতলা তো তারা রয়েছেই, এখন দরকার খালি মার্বেল গুলির। তাহলেই ডিমস্থিনিস্ বানাবার আর বাকী কী রইল ?

হিরণ্যাক্ষ। তা বটে।

হিরণ্ময়। নেই আবার। বক্তার অভাবেই তো দেশটা মাটি হচ্ছে। দেশের এত দুর্গতি। লোককে কাজে প্রেরণা দিতে তো বলতে হবে, বলে বোঝাতে হবে। বক্তা চাই আগে—শত সহস্র বক্তা চাই, তা না হলে এই ঘুমন্ত দেশ কি জাগবে ? কেন, বক্তৃতা ভালো লাগে না তোমার ?

হিরণ্যাক্ষ। খুব ভালো লাগে—থেমে যাবার পর। কিন্তু যখন চলতে থাকে, তখন মনে হয় কালারাই এই দুনিয়ায় সুখী।

নিরঞ্জন। কালারাই ? তাহলে আমি এমন বক্তা তৈরি করবো যারা শুধু মানুষের চোখ ফোটাবে না, কালাদেরও কান ফুটিয়ে দেবে।

হিরণ্যাক্ষ। কি বল্লে ? কান ফুটো করে দেবে ?

নিরঞ্জন। নিশ্চয়, তা নইলে বক্তা কিসের! বক্তৃতা কী! তাহলেই ভেবে দেখো, দেশের জন্য চাই বক্তা আর বক্তার জন্যে চাই তোতলা। কেন না ডিমস্থিনিসের মতো বক্তা কেবল তোতলাদের পক্ষেই হওয়া সম্ভব, যেহেতু ডিমস্থিনিস্ নিজে একজন তোতলা ছিলেন। অতএব ভেবে দেখলে, তোতলারাই আমাদের ভাবী আশাভরসা, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। কী, কি ভাবচো কি ?

হিরণ্যাক্ষ। ভাবছি কি করে তোতলা হওয়া যায়।

নিরঞ্জন। তোতলাদের একটা ইস্কুল খুলব। সবই ঠিক। বিস্তর তোতলাকে রাজিও করিয়েছি। এখন ইস্কুলের একটা পছন্দসই নাম পেলেই হয়। ভালো নামের অভাবে ইস্কুলটা খোলা হচ্ছে না।

হিরণ্ময়। নামের আবার অভাব কি?

নিরঞ্জন। একটা নাম ঠিক করে দাও না ভাই। নাম না হলে কি চলে?

হিরণ্ময়। কেন, নাম তো পড়েই আছে। নিঃস্বভারতী খাসা নাম। চমৎকার।

নিরঞ্জন। নিঃস্বভারতী? তার মানে—

হিরণ্ময়। ভারতী মানে বাক্য। বাক্য যাদের নিঃস্ব, কিনা, থেকেও নেই—তারাই হোলো গিয়ে নিঃস্বভারতী।

নিরঞ্জন। উঁহু, ও নাম দেওয়া চলবে না। বিশ্বভারতী ভাববে তাদের দেখে তাদের থেকেই নামটা চুরি করেছি। তারা আপত্তি করতে পারে।

হিরণ্যাক্ষ। কিন্তু বড্ডো লম্বা হোলো না?

হিরণ্ময়। তাতো হোলোই যেদিন দেখবে, তোমার ছাত্ররা তাদের ইস্কুলের পুরো নামটা অবলীলায় উচ্চারণ করছে—গড়গড় করে গড়িয়ে দিচ্ছে—আটকাচ্ছে না কোথাও, সেদিনই বুঝবে তারা পাস হয়ে গেছে। তখন তারা সেলাম ঠুকে বিদায় নিতে পারে কিম্বা জিভ দেখিয়ে।

হিরণ্যাক্ষ। নামকে নাম, কোশ্চেন-পেপারকে কোশ্চেন-পেপার!

নিরঞ্জন। ঠিক বলেছ, এই নামটাই থাকলো তবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

তোতলামি সারানোর ইস্কুলে হিরণ্ময় ও হিরণ্যাক্ষ।

হিরণ্ময়। অনেকদিন থেকেই ইস্কুলটা দেখতে আসবো আসবো ভাবি—কিন্তু সময়াভাবে আর আসা হয়ে ওঠে না।

হিরণ্যাক্ষ। আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু অবকাশ পাই না, তার পরে সঙ্গী না পেলে কোথাও যাবার উৎসাহ হয় না আজকাল।

হিরণ্ময়। আমারো তাই। আজ তোমাকে পেলাম বলেই এধারে আসা হোলো। কিন্তু অনেকদিন থেকে নিরঞ্জনের ইস্কুলের খবর কানে আসছিলো—

হিরণ্যাক্ষ। নিরঞ্জন এদিকে দেশের আর দশের উপকার করে মরছে, আর আমরা যে এখানে এসে ওকে একটু উৎসাহ দেব এটুকুও আমাদের সময় হয় না। ধিক্ আমাদের!

হিরণ্ময়। মার্বেল গুলির কল্যাণে নিশ্চয় অনেকের তোতলামি সেরেছে এতদিনে। ডিমস্থিনিসের মত বক্তা বানাতে মার্বেলের গুলি অব্যর্থ।

হিরণ্যাক্ষ। তাছাড়া মার্বেল গুলির আরও উপকারিতা আছে —যেমন দাঁত শক্ত করা, মুখের হাঁ বড়ো করা—আনুষঙ্গিক ভাবে এসবও হয়ে যায়। এসব লাভও নেহাৎ কম নয়।

[কয়েকটি ছেলে এসে ঢুকলো]

একটা ছেলে। কা—কা—কা—কা—কাকে চান?

দ্বিতীয়টি। মা—মা—মা—মা—মা—মা—মা······?

তৃতীয়জন। মাস্টার বা—বা—বা—বা—বা···?

হিরণ্যাক্ষ। কাকাকে, মামাকে কি বাবাকে কারুকে আমরা চাইনে। নিরঞ্জন আছে?

[ছেলেরা মুখচাওয়াচাওয়ি করে।
জনৈক আধাবয়সী ভদ্রলোকের প্রবেশ]

ভদ্রলোক। মাস্টার বা—বাবুকে খুঁ—খুঁজছেন আপনারা ডে—ডেকে দিচ্ছি। আমিই এই ই—ইস্কুলের কে—কে—কে— কেলার্ক।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান। ছেলেদেরো]

হিরণ্যাক্ষ। বাঃ, নিরঞ্জনের বেশ রুচি আছে। তোতলামির ইস্কুলে ক্লার্কও তোতলা দেখে রেখেছে। মন্দ নয় ত।

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নিরঞ্জন। এই যে অ—অনেক দিন প—পরে।

হিরণ্ময়। [হিরণ্যাক্ষকে জনান্তিকে] হ্যাঁরে, তোতলাদের পাল্লায় পড়ে নিরঞ্জনও তোতলা হয়ে গেল না-কি?

হিরণ্যাক্ষ। বোধ হয় ঠাট্টা করছে আমাদের সঙ্গে।

নিরঞ্জন। তা খ—খবর সব ভা—ভালো!

হিরণ্ময়। মন্দ কি—কিন্তু তোমার খবর তো ভালো বোধ হচ্ছে না! তোতলামি প্র্যাক্‌টিস্ করছো নাকি? কবে থেকে?

নিরঞ্জন। প্যা—প্যা—প্যা—প্যারাক্—প্র্যাক্‌টিস্ করব কেন! তো—তো—তোতলামি কি কে—কেউ প্র্যাক্‌টিস্ করে!

হিরণ্যাক্ষ। তবে তোতলামিতে প্রোমোশন পেয়েছো বলো!

নিরঞ্জন। ভাই হি—হি—হির—হিরণ্—ণ্যা ক্ষা—ক্ষা—ক্ষা—ক্ষা—ক্ষা—

হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যাক্ষ বলতে যদি তোমার কষ্ট হয়, মুখে বাধে, না হয় তুমি আমাকে হিরণ্যকশিপুই বোলো। 'কশিপু'র মধ্যে 'দ্বিতীয় ভাগ' নেই।

নিরঞ্জন। ভাই হি—হিরণ্যকশিপু, আমার এই স্যানাটো—টো—টো—টো.........

হিরণ্ময়। বুঝেছি, তোমার এই স্যানাটোজেন, তারপর?

নিরঞ্জন। [চটে গিয়ে] স্যানাটোজেন? আমার ইস্কুল হো—হো—হোলো গিয়ে স্যা—স্যানাটোজেন? স্যানাটোজেন তো এ—একটা ও—ও—ওষুধ!

হিরণ্যাক্ষ। আহা, ধরেই নাও না হে! তোমার ইস্কুলও তো একটা ওষুধ বিশেষ। তোতলামি সারানোর একটা ওষুধ নয় কি?

নিরঞ্জন। [খুসি হয়ে একটু হাসল] তা—তা—বটে!

হিরণ্ময়। তা, তোমার ছাত্ররা কদ্দূর ডিমস্থিনিস্ হোলো?

নিরঞ্জন। ডিম—ডিম হয়েছে।

হিরণ্যাক্ষ। বলো কি! তা, আদ্দেক যখন হয়েছে, তখন পুরো হতে আর বাকি কী?

হিরণ্ময়। বাকিটাও হয়ে যাবে। ঘাবড়ো না। লেগে থাকো।

নিরঞ্জন। আ—আর হবে না! মা—মা—মা—মা—মার্বেলই মুখে রাখতে পারে না তো কি—কি—কি—করে হবে?

হিরণ্যাক্ষ। মুখে রাখতে পারে না! কেন পারে না!

নিরঞ্জন। স—স—সব গি—গিলে ফ্যালে।

হিরণ্ময়। গিলে ফ্যালে! তা হলে আর তোতলামি সারবে কি করে?

হিরণ্যাক্ষ। সত্যিই তো! তা, তুমি নিজেরটা সারিয়ে ফেল। যেমন করে হোক মার্বেল-টার্বেল মুখে রেখে—যা করে হয়। রোগের গোড়াতেই চিকিৎসা হওয়া দরকার, দেরি করা ঠিক না।

নিরঞ্জন। [হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে] আ—আমার যে ডি—ডি—ডি—ডিস্ পে—পে—পেপ্‌সিয়া আছে। হ—হ—হজম করতে পারবো কেন।

হিরণ্ময়। ও, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া থাকলে তোতলামি সারে না বুঝি।

নিরঞ্জন। আ—আর আমার কি পা—পা—পা—পাথর হজম করার ব—ব—বয়েস আছে।

হিরণ্ময়। কেন, পাথর হজম করতে হবে কেন!

নিরঞ্জন। আ—আমিও যে গি—গিলে ফেলি।

হিরণ্যাক্ষ। তাইত! ভারি মুস্কিল তো! তাহলে…

হিরণ্ময়। ছেলেরা সব নিয়মমত বেতন দেয় তো?

নিরঞ্জন। উঁহু স—সব ফি—ফ্রি যে! অ—অনেক সা—সাধাসাধি করে আ—আনতে হয়েছে।

হিরণ্যাক্ষ। তবে তোমার চলছে কি করে!

নিরঞ্জন। কে—কেন! মা—মা—মার্বেল বেচে! এক—একজন দ—দ—দশটা বা—বারোটা করে খা—খায় রোজ। ওগুলো মু—মুখে রাখা ভা—ভা—ভারি শক্ত!

হিরণ্ময়। ব—ব—ব—বটে!

হিরণ্যাক্ষ। ব—ব—ব—ব—ব—বলো কি!

হিরণ্ময়। [হিরণ্যাক্ষের দিকে সভয়ে তাকিয়ে] অ্যাঁ! আ—আমিও কি তো—তোতলা হয়ে গেলাম নাকি!

হিরণ্যাক্ষ। ভা—ভা—ভারি মা—মা—মা—মারাত্মক জায়গা! এখানে আর থেকো না……পা—পা—পা—পালাও।

যবনিকা

প্রাণকেষ্টর কাণ্ড

প্রাণকেষ্টর কাণ্ড

আদালত কক্ষ। মাধ্যমিক বিরতির সময়। হাকিম এজলাসে নেই, লাঞ্চে গেছেন—উকিলদের বেঞ্চি ফাঁকা। প্রাণকেষ্ট পতিতুণ্ডি এবং আবালবৃদ্ধ কয়েক ব্যক্তি রয়েছেন—মামলার পুনরারম্ভের অপেক্ষায়।

[দু'জন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন]

একজন। [আরেকজনের কাছে প্রাণকেষ্টর পরিচয় দিয়ে]—ইনিই প্রাণকেষ্টবাবু—ইনিই সেই। এই হুলুস্থুল বাধিয়েছেন—ইনিই। প্রাণকেষ্ট, ইনি খবরের কাগজ থেকে আসছেন—তোমার সঙ্গে মুলাকাৎ করতে।

দ্বিতীয় জন। হ্যাঁ, আমাদের কাগজের তরফ থেকে আপনার বিবৃতি নিতে এলাম।

প্রাণকেষ্ট। [ম্লান হেসে]—খুব কি হুলুস্থুল পড়েছে ?

প্রথম জন। পড়বে না ? মেম্‌কে চড় মারা কি চারটিখানি ? মেম্‌টি স্থূল বলে নয়—মেম্ বলেই এই হুলুস্থুল !

প্রাণকেষ্ট। তা আমি কী বিবৃতি দেব ? আমার আর কী বলবার আছে ?

সাংবাদিক। কিচ্ছু নেই ? বলেন কী মশাই ? বলা নেই কওয়া নেই, চেনা পরিচয় নেই, হঠাৎ এক মেম্‌কে অমন করে চড় মেরে বসলেন—বাসে আসতে···

প্রাণকেষ্ট। আস্তে নয়, বেশ জোরেই। জোরেই মেরেছি তো।

তৃতীয় ব্যক্তি। জোরে ? সে তো আরো খারাপ। খুবই খারাপ ! আর মেয়েছেলের গায়ে কেউ হাত তোলে কখনো ? মেম্ কি মেয়েছেলে নয় ?

প্রাণকেষ্ট। মেয়েছেলে? হ্যাঁ, মেয়েছেলেই বটে!

তৃতীয় ব্যক্তি। মেয়েদের গায়ে কি হাত তুলতে আছে? ছিঃ!

প্রাণকেষ্ট। হ্যাঁ, মেয়েই বটে, কিন্তু অমন হৃষ্টপুষ্ট মেম্ আমি জীবনে দেখিনি—যেমন হৃষ্ট, তেমনি পুষ্ট—

তৃতীয় জন। হোলোই বা হৃষ্টপুষ্ট—তাই বলে তুমি তাকে গায়ে পড়ে ঠেঙাতে যাবে?

সাংবাদিক ভদ্রলোক। আপনার চড়ের ফলে পুষ্টতা তাঁর কিছু না বাড়লেও হৃষ্টতা ঢের হ্রাস পেয়েছিলো, আমার মনে হয়।

চতুর্থ ব্যক্তি [একটু পণ্ডিতী চেহারার]। ছিঃ, বাবা প্রাণকেষ্ট, এ কাজ তোমার উপযুক্ত হয়নি। মাতৃবৎ পরদারেষু—এ কথা কি পড়োনি তুমি চাণক্যশ্লোকে? তোমার ছেলেবেলায় পড়োনি কি?

প্রাণকেষ্ট। মা—তৃ—বৎ—হ্যাঁ—মাতৃবৎই বটে!

প্রথম ব্যক্তি। [চতুর্থ ব্যক্তিকে] তা মশাই, পরদারেষু পর্দার আড়ালে থাকলেই তো হয়—তাহলেই আর পরের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হয় না এমন!

পঞ্চম ব্যক্তি। কিসের মাতৃবৎ! আমাদের কার বাবা ক'টা মেম্ বিয়ে করতে গেছে শুনি? আপনিই বলুন না!

চতুর্থ ব্যক্তি। বেশ, মাতৃবৎ নাই বা হোলো, পরের জিনিস তো? পরদ্রব্য তো বটে! পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ—এটা—এটা তো আপনি মানেন? মেম্ কিছু কারো নিজের দ্রব্য নয়? পরের মেমের গায়ে হাত তোলা কি ঠিক হয়েছে প্রাণকেষ্টবাবুর?

একটি তরুণ যুবক। হ্যাঁ, সাহেব হলেও না হয় কথা ছিলো। মেম্ মেরে কিছু দেশোদ্ধার হয় না!

দ্বিতীয় এক যুবক। [তার প্রতিবাদে] হয় না, কিন্তু সাহস বাড়ে। এই সাহসই মেম্ থেকে ক্রমে সাহেবে গড়ায়। ক্রমে ক্রমে সাহেবে সাহেবে গড়িয়ে চলে—

প্রথম যুবক। সাহেবে সাহেবে। কতো রকমের সাহেব আছে শুনি মশাই?

দ্বিতীয় যুবক। সাহেব কি এক রকমের? ইংরেজ সাহেব থেকে ফ্রেঞ্চ সাহেব—ফ্রেঞ্চ থেকে পোর্তুগীজ সাহেব—পর্তুগীজ থেকে ওলন্দাজ—ওলন্দাজ থেকে দিনেমার—মারতে মারতে চলে যাও না! নেদারল্যাণ্ড পর্যন্ত দেদার সাহেব!

তৃতীয় যুবক। তার পরও তো ইয়াঙ্কি সাহেব রয়ে গেল! ফিলিপাইন থেকে শ্যামরাজ্য অব্দি সারা দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের ডলারের সাম্রাজ্য ছড়ানো—

দ্বিতীয় যুবক। কিন্তু সেই সাম্রাজ্য ক'দিনের! যদি এই মারামারি বেড়েই চলে—মেম্ থেকে সাহেবে ছড়ায়—সাহেব থেকে সাহেবে সাহেবে—প্রাণকেষ্ট বাবুর মতন হাজার হাজার প্রাণকেষ্ট দেখা দেয়—তাহলে—তাহলে এশিয়ার বুকে সাদা চামড়ার এই সাহেবি-আনা আর ক'দিনের?

তৃতীয় যুবক। প্রাণকেষ্টবাবু আপনি ধন্য! আপনাকে আমরা সাধুবাদ দিই। আদালতের বিচারে যদি আপনি খালাস পান তাহলে আমাদের ইচ্ছে আছে আমাদের নব্য যুবকসঙ্ঘের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা-সভা ডেকে আপনার উপযুক্ত অভিনন্দন আপনাকে দেব। আশা করি, আপনি তাতে অমত করবেন না।

প্রাণকেষ্ট। কী সর্বনাশ!

সাংবাদিক! এইবার আপনার বিবৃতিটা দিন তো। তারপর আমাদের ক্যামেরাম্যান এসে আপনার ফটো তুলে নেবে—

প্রাণকেষ্ট। ফটো আবার? ফটোও আছে এর ওপর?

সাংবাদিক। হ্যাঁ, ফটোও নিতে হবে বই কি! তবে এখন নয়। টিফিনের পর আদালত বসলে, আপনি যখন জবানবন্দী

দেবেন সেই সময়ের ফটো একখানা। কাল আমাদের পত্রিকায় বেরুবে দেখবেন।

প্রথম ব্যক্তি। মেম্‌কে মেরে ফেমাস হয়ে গেলে হে! তোমার ফেম্ ছড়িয়ে পড়লো চার ধারেই।

পঞ্চম ব্যক্তি। একেই বলে কপাল। এত মেম্ তো চোখে পড়ে, হাতের নাগালেও আসে তো। কিন্তু কেন জানিনে, পোড়া হাত উঠতেই চায় না কিছুতেই!

তৃতীয়। ধন্য! ধন্য প্রাণকেষ্টবাবু! অদ্ভুত বীরত্ব আপনার!

সাংবাদিক। আচ্ছা, বলুন তো এখন, মেম্‌টিকে কেন হঠাৎ আপনি মারতে গেলেন? বিস্তারিত করে বলুন, সমস্ত আমি টুকে নিচ্ছি আমার নোট বুকে।

[খাতা পেনসিল বার করলেন]

চতুর্থ ব্যক্তি। মাথা খারাপ হয়েছিলো বোধ হয়? নইলে কেউ কি অমন করে ক্ষেপে যায় হঠাৎ?

তৃতীয় ব্যক্তি। ক্ষেপে যাবার হেতু? মেম্ বুঝি মারতে এসেছিল তোমায়, না, প্রাণকেষ্ট? তাই তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাতেই—বাধ্য হয়েই—তাই কি…?

সাংবাদিক। ও, তাই! আত্মরক্ষার খাতিরেই বুঝি? কিন্তু মেম্‌রা তো সচরাচর কাউকে কিছু বলে না।

একটি ছোট্ট ছেলে। [ওদের মধ্যে থেকে হঠাৎ] হ্যাঁ, কাউকে কখনো কামড়ায়ও না তো মেম্‌রা।

তৃতীয় ব্যক্তি। তুমি কেহে ছোক্‌রা? এই আদালতের গুলতানিতে? আদার ব্যাপারে জাহাজের খবর নিয়ে?

ছেলেটি। আমি পাড়ার ছেলে।

চতুর্থ ব্যক্তি। কোন্ পাড়ার?

ছেলেটি। প্রাণকেষ্টবাবুর পাড়ার। আমাদের কাগজে আমরা ওঁর জীবনী ছাপবো। সেইজন্যই এসেছি।

সাংবাদিক। তোমাদেরও আবার পত্রিকা আছে নাকি হে?

ছেলেটি। রীতিমতো নামজাদা কাগজ—জানেন? অনেক নামকরা লেখক লেখেন আমাদের কাগজে।

সাংবাদিক। মুদ্রণ-সংখ্যা? মানে, কতো ছাপা হয় তোমাদের পত্রিকা?

ছেলেটি। আমাদের পাড়ার একমাত্র মুখপত্র। মুদ্রণ-সংখ্যা মাত্র এক্। হাতে লেখা পত্রিকা কিনা!

সাংবাদিক। ও, হাতে লেখা! তাই বলো!

ছেলেটি। কিন্তু হাতে হাতে ঘোরে মশাই! আপনাদের কাগজের মতো না, যে পড়ে আর ফেলে ছ্যায়। নয়তো-বা শিশি-বোতলওলাকে বেচে ছ্যায়! আমাদের পত্রিকা পড়তে পায় না।

প্রাণকেষ্ট। সত্যি, আমিও পড়তে পাইনি।

ছেলেটি। একটি মোটে লেখক যে। লেখা দেন অনেকেই, কিন্তু লিখতে হয় সব এই আমাকেই। সেইজন্যেই তো! তা, আপনার জীবনী যদি না দেন অন্তত আপনার একটা বাণী দিন—কিম্বা আশীর্বাণী—

[জলযোগের কাল উত্তীর্ণ হইতেই আদালতের চোপদারের প্রবেশ]

চোপদার। চোপ্ চোপ্! হল্লা কোরো না কেউ। হাকিম সাহেব আসছেন।

[ক্রমে ক্রমে উকীলেরা এসে নিজেদের আসন দখল করলেন। হাকিম এলেন। তারপরে কাজ সুরু হোলো আদালতের]

পাবলিক প্রসিকিউটার। এইবার আসামীর সওয়াল সুরু হোক—

আসামী পক্ষের উকীল। ধর্মাবতার, আমার আসামীর একটি আর্জী আছে। তার যা কিছু বলবার, আপনার কাছেই সে নিবেদন করতে চায়।

হাকিম। বেশ তো, বেশ তো! বলুক না! [প্রাণকেষ্টকে] যা বলবে—খোলাখুলি বলো। খুলে বলো সব। ভয় নেই, কোনো কথা গোপন না করে বলো।

প্রাণকেষ্ট। শুনুন ধর্মাবতার, বলি তাহলে—[ম্লান হাসির সঙ্গে সুরু হলো তার] কেন যে এমনটা ঘটলো সেকথা এখন পর্যন্ত কাউকে আমি বলিনি—আমার স্ত্রীকেও না। কিন্তু আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন বলি। খোলাখুলিই বলবো—যখন সব জানতে চাইছেন আপনি—লুকোবনা কিছুই। শুনুন ধর্মাবতার, বলি তাহলে—। কেন যে এমনটা ঘটে গেল বলি সে-কথা—। শ্বেতাঙ্গ মহিলাটি বাসে উঠলেন।

হাকিম। তুমি তখন কোথায় ছিলে?

প্রাণকেষ্ট। আজ্ঞে, সেই বাসেই। সেখানেই ছিলাম। আগে থেকেই উঠে বসেছিলুম। তার পরের মোড়ে এই মহিলাটি উঠলেন। উঠে বসলেন। বসলেন আমার সামনেই। তারপরে তিনি তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ বার করলেন, তারপর তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন, মনিব্যাগ খুললেন, খুলে একটা আনি বার করলেন। আনিটি বার করে মনিব্যাগ বন্ধ করলেন, ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ রাখলেন, রেখে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন—তারপর উনি তাকিয়ে দেখলেন যে কণ্ডাক্টার বাসের দোতালায় উঠছে। অতএব আবার তিনি তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ বার করলেন।

হাকিম। কিন্তু এত খোলাখুলি কেন রে বাপু! আমি তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

প্রাণকেষ্ট। আজ্ঞে, আপনি তো বললেন সব খোলাখুলি বলতে। খোলাখুলির সমস্তটাই তাই আপনাকে জানাচ্ছি আগাগোড়া।

হাকিম। জানাও।

প্রাণকেষ্ট। তারপর উনি দেখলেন—কণ্ডাক্টার দোতালায় গেল। তখন তিনি ভ্যানিটিব্যাগ খুলে তাঁর মনিব্যাগ বার করলেন, করে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন, মনিব্যাগ খুললেন, খুলে আনিটি রাখলেন তার ভিতরে। রেখে মনিব্যাগ বন্ধ করলেন, করে ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগটি রাখলেন, রেখে ভ্যানিটি-ব্যাগটি বন্ধ করলেন—

হাকিম। মনিব্যাগ বন্ধ করলেন, তাই বলো।

প্রাণকেষ্ট। মনিব্যাগ বন্ধ করলেন? না, হুজুর, তাই কী? মনিব্যাগ খুলে তার মধ্যে ভ্যানিটিব্যাগ রাখলেন? না, ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলে মনিব্যাগ রাখলেন? না—কি মনিব্যাগ খুলে ভ্যানিটিব্যাগ বার করলেন? না না, তা কি করে হয়? মনি-ব্যাগের ভেতর থেকে ভ্যানিটিব্যাগ কি বার করা যায় কখনো? মনিব্যাগের ভেতরে ভ্যানিটিব্যাগ রাখাই যায় না যে, তা কি করে হতে পারে হুজুর?

হাকিম। তুমিই জানো। আমি তার কী জানি!

প্রাণকেষ্ট। আপনি সমস্ত গোলমাল করে দিলেন হুজুর! আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন! দাঁড়ান হুজুর, ফের তাহলে আগের থেকে সুরু করি, গোড়ার থেকে খেই ধরি আবার।

হাকিম। না না, আর গোড়া থেকে নয়। মাঝামাঝি সুরু করলেই হবে—সেই যেখানে মেম্‌টি দেখলো যে কণ্ডাক্টার দোতালায় যাচ্ছে তারপর থেকেই—

প্রাণকেষ্ট। তারপর থেকে? তার পর উনি দেখলেন যে কণ্ডাক্টার বাসের দোতালায় যাচ্ছে! দেখে ফের তিনি তাঁর

ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ বার করলেন, বার করে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন, বন্ধ করে মনিব্যাগ খুললেন—

হাকিম। বন্ধ করে মনিব্যাগ খুললেন? সে আবার কি রকম? বন্ধ করছেন আবার খুলছেন—দু'রকমের দুটো কাজ একসঙ্গে হয় কি করে?

প্রাণকেষ্ট। কি করে হয় তা বলতে পারব না হুজুর, তবে হয়েছিল—হচ্ছিল—এইটুকুই শুধু বলতে পারি। একটা খুলছেন আরেকটা বন্ধ করছেন—একটার পর একটা ঘটছে। ঘটে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে—পরম্পরায়।

হাকিম। ওঃ, বুঝেছি।···আচ্ছা, বলে যাও।

প্রাণকেষ্ট। তখন উনি দেখলেন কণ্ডাক্টার বাসের দোতলার দিকে হেলে দুলে রওনা দিলো। দেখে না, আবার উনি ওঁর ভ্যানিটি-ব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ বার করলেন, মনিব্যাগ বার করে তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন—কোন্টার ভাগ্যে কী ঘটছে ভালো করে লক্ষ্য রাখুন হুজুর! তারপর ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করে মনিব্যাগ খুললেন, মনিব্যাগে তাঁর আনিটি যথাস্থানে রাখলেন তারপর।

হাকিম। ভালো করলেন। তারপরে?

প্রাণকেষ্ট। ভালো করলেন? না, ভালো আর কী করলেন হুজুর! তারপর তিনি তাঁর আনিটি রেখে মনিব্যাগ বন্ধ করলেন, করে তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগটি রাখলেন ভেতরে—রেখে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন তারপর। করবার পর তিনি দেখলেন কণ্ডাক্টার নামছে সিঁড়ি দিয়ে। কণ্ডাক্টারকে একতলায় আসতে দেখে ফের তিনি তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ বার করলেন, বার করে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন, তারপর মনিব্যাগ খুললেন, খুলে একটা আনি বার করলেন, আর তাঁর মনিব্যাগ বন্ধ করলেন—

হাকিম [অস্থির হয়ে]। থামো—থামো! তুমি আমায় পাগল করে দেবে দেখছি!

প্রাণকেষ্ট। আজ্ঞে, হুজুর, আমারও ঠিক তাই হয়েছিলো বোধ হয়। পাগল হতে আর কিছু বাকী ছিল না আমার। ক্ষেপে গেছলাম মনে হয়—

হাকিম। ক্ষেপে যাবার কী আছে এতে? সমস্ত ব্যাপারটা অতো ভণিতা না করে এক কথায় কি বোঝানো যায় না? বলা যায় না কি এক ক্ষেপে?

প্রাণকেষ্ট। এক ক্ষেপে? এক ক্ষেপে কি করে বলবো হুজুর? ক্ষেপে ক্ষেপে হচ্ছিল যে—

হাকিম। [চড়া গলায়] হচ্ছিল তো হচ্ছিল। সেখানে হচ্ছিল। এখানে তার কী? এখানে কি সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে বলা যায় না—একটু চেষ্টা করলে?

প্রাণকেষ্ট। চেষ্টা করলে? 'চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই' বলে বটে লোক! কিন্তু চেষ্টা করলে কি ছুঁচের ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে একটা হাতী গলানো যায়? ছুঁচ নড়লে কি সুতো ঢোকানো যায়? হাজার চেষ্টা করুন, পারবেন না কিছুতেই। এটাও ঠিক তেমনি এক সূচীভেদ্য ব্যাপার হুজুর! ছুঁচের না হলেও ছুঁচোমির ব্যাপার তো বটেই!

হাকিম। কিন্তু তুমি তো বাপু, ছুঁচই ফোটাচ্ছো তখন থেকে। আসল কথার সূত্রপাত কই?

প্রাণকেষ্ট। আজ্ঞে, বলছি তো। হুজুর বলেছেন সব কথা খুলে বলতে। কিচ্ছুটি না গোপন করে—সমস্ত খোলসা করতে বলেছেন হুজুর। আমিও তাই—আজ্ঞে আমারো তাই না বলে উপায় নেই। যেমন যেমনটি আমি দেখেছি তেমন তেমনটি

হুজুরকেও আমি দেখাতে চাই। তারপর তিনি করলেন কী শুনুন! মনিব্যাগ বন্ধ করে তাঁর ভ্যানিটিব্যাগটা খুললেন। খুলে—

হাকিম। কী! কী দেখাতে চাও? আমাকে দেখাতে চাও? বটে? আমার এজলাসে—আমার সামনে দাঁড়িয়ে—আমাকেই তুমি দেখাতে চাও? এতদূর আস্পর্ধা? [হাকিমের চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে] তবে ছাখো—এই ছাখো! [এই বলে আসন ছেড়ে উঠে কাটগড়ার কাছে গিয়ে প্রাণকেষ্টর গালে পেল্লায় এক চড় বসিয়ে দিলেন] এই ছাখো তবে। হয়েছে এবার?

প্রাণকেষ্ট। আজ্ঞে হুজুর, আমিও এর বেশি কিছু করিনি। [নিজের গালে হাত বুলাতে বুলাতে] এর বেশি আর কিছুই করিনি আমি মেম্‌টিকে। এখন আপনি দেখলেন তো? দেখলেন তো সব? দেখতে পেলেন তো হুজুর?

যবনিকা

এক স্বর্ণঘটিত অপকীর্তি
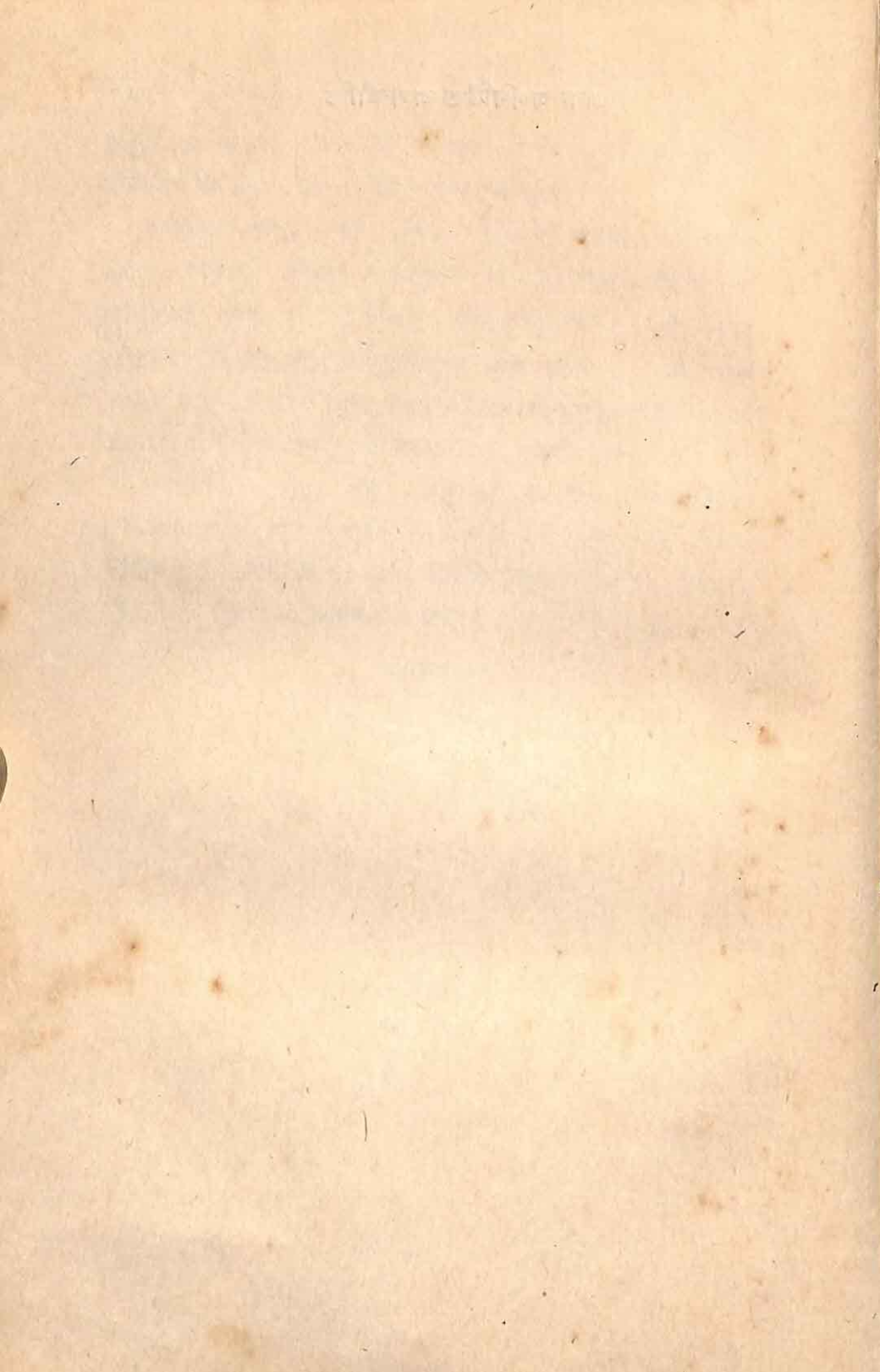
এক স্বর্ণঘটিত অপকীর্তি

কর্তা সকালের খবরের কাগজ পড়ছেন, এমন সময়ে গিন্নি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন—

গিন্নি। ওগো আমার সর্বনাশ হয়েছে গো—

কর্তা। [খবরের কাগজের থেকে চোখ তুলে তাকালেন গিন্নির দিকে] অ্যাঁ ?—

গিন্নি। ওগো আমার কী সর্বনাশ হোলো গো! আমি কি করব গো—

কর্তা। কি—হয়েছে কী ?

গিন্নি। চুরি গেছে। আমার সর্বস্ব চুরি গেছে, সব গয়না—যথাসর্বস্ব—

কর্তা। চুরি গেছে ? সে কি ? [তারপরে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে, নিঃশ্বাস ফেলে] ও! তাই বলো! গয়না চুরি! তোমার সব গয়না—তাই বলো !! আমি ভেবেছি, না জানি কী !

গিন্নি। সব নিয়ে গেছে, একখানাও রাখেনি গো—

কর্তা। একখানাও রাখে নি নাকি ? বটে ? তাহলে তো ভাবনার কথাই বলতে হয়।

গিন্নি। ভাবনার কথা কি গো, আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে! কে আমাদের এমন সর্বনাশ করে গেল গো—

কর্তা। আহাহা, চেঁচিয়ো না। চেঁচিয়ো না অমন করে। যেতে দাও—যা গেছে তার জন্যে দুঃখ করে কি হবে ? গতস্য শোচনা নাস্তি—

গিন্নি। তুমি বলছ কিগো ? হায় হায়, আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল—[তিনি আরো গলা চড়ান্]।

কর্তা। আরে থামো থামো। করছো কি? পাড়ার সবাই টের পাবে যে—

গিন্নি। পেলে তো বয়েই গেল! তাদের টের না পাবার জন্যে যেন আমার ঘুম হচ্ছে না। ভালো করে টের পাক্।

কর্তা। ঘরের কথা কি কেউ পরকে জানায়? অন্দরের খবর কি বাইরে বেফাঁস করতে আছে? নিজেদের লোকসানের কথা লোক-জানাজানি হওয়াটা কি ভালো?

গিন্নি। আমার এত টাকার গয়না গেল আর পাড়ার লোক জানতে পারবে না! কোনোদিন গা সাজিয়ে পরতে পেলুম না, পরে দেখাতে পারলুম না হিংসুটেদের। জানুক না মুখপুড়িরা।

কর্তা। উহুঁহু, তুমি বুঝছো না গিন্নি! চুরির খবর সবাই জানলে—পাড়ায় রটে গেলে পুলিশ এসে পড়বে যে! আর পুলিশ এলেই বাড়ী ঘর খানাতল্লাস করবে। খান্নাতল্লাসির মতো খারাপ জিনিস আর হয় না। গয়না তো গেছেই, তখন আরো অনেক কিছু যাবে—যার জন্যে কেঁদে কূল পাবে না। জিনিসপত্তর তছ্‌নছ্‌ করে—সে এক হাঙ্গাম! এক পেল্লায় কাণ্ড!

গিন্নি। [একটু ভড়কে গিয়ে] কেন গো, চুরি গেলেই লোকে পুলিশে খবর দেয় এই তো জানি। পুলিশেই তো চুরির কিনারা করে।

কর্তা। পুলিশে কি না করে! আর, সেইখানেই তো আসল ভয়! চোরের কিনারায় পৌঁছবার জন্যে যা সব তারা করে তার ঠ্যালা সাম্‌লাতেই প্রাণ যায়!

গিন্নি। তাহলে পুলিশ রেখেছে কি জন্যে? চোর ধরবার জন্যেই তো? চোর পাক্‌ড়ায় কে শুনি? পুলিশেই তো?

কর্তা। যদি হাতে-নাতে ধরতে পারে তবেই—তা না হলে আর পাকড়াতে হয় না।

গিন্নি। হ্যাঁ, হয় না? তুমি বল্লেই! সব জানো তুমি!

কর্তা। তা, তেমন পীড়াপীড়ি করলে নিয়ে যায় একজনকে ধরে পাকড়ে। ওদের কি, নিয়ে গেলেই হোল একটাকে। এখানে চোরকে হাতে না পেয়ে আমাকেই ধরে কিনা কে জানে!

গিন্নি। তোমায় কেন ধরতে যাবে? [গিন্নির বিস্ময়]

কর্তা। সব পারে ওরা। হাঁস আর পুলিশ—ওদের পারতে কতক্ষণ? দেখতে না দেখতে পেড়ে বসেছে। তবে তফাৎ এই, হাঁস পাড়ে হাঁসের ডিম, আর ওরা পাড়ে ঘোড়ার ডিম।

গিন্নি। ঘোড়ার ডিম?

কর্তা। ঘোড়ার ডিমের আবার মামলেটও হয় না। বিল্‌কুল বাজে। অখাদ্য!

গিন্নি। তুমি পুলিশে খবর দাও। আমি বলছি, তোমাকে কক্ষনো ধরবে না।

কর্তা। নাঃ, ধরবে না আবার? আমাকেই তো ধরবে। আর ধরলেই আমি সব স্বীকার করে ফেলব। তা কিন্তু বলে রাখচি। করাবেই ওরা স্বীকার—না করলে ছাড়বে না। না করে রেহাই নেই। তাই করানোই ওদের কাজ, আর তাহলেই ওদের চুরির কিনারা হয়ে গেল।

গিন্নি। চুরি না করেও তুমি স্বীকার করবে যে চুরি করেছ?

কর্তা। করবই তো। নয় তো কি, পড়ে পড়ে মার খাবো নাকি? মরতে যাবো নাকি? সকলেই করে। ওরকম অবস্থায় পড়লে স্বীকার করাটাই দস্তুর। পুলিশের হাতে পড়লে মানতে হয়—ওরা যা যা বলে সমস্ত। অনেকে আস্তে আস্তে স্বীকার করে—হাড়গোর ভেঙে গুঁড়ো হবার পরে। আর যারা চালাক, তারা আগে-ভাগেই, আস্ত থাকতেই, সব মেনে নেয়। বিল্‌কুল!

গিন্নি। তুমি যদি তেমন ছ্যাখো, না হয় মেনে নিয়ো। তাহলেই ছেড়ে দেবে তো ?

কর্তা। হ্যাঁ—দেবে। একেবারে জেলের মধ্যে নিয়ে ছাড়বে। পাক্কা পাঁচ বছরের ধাক্কা।

গিন্নি। [সন্ত্রস্ত হয়ে] না, তবে কাজ নেই তোমার স্বীকার করে, গয়না আমার চাইনে।

কর্তা। সেই কথা বলো। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ভাবনা কি ? কিসের অভাব ? আবার গয়না গড়িয়ে দেব। আরেক সেট্।

গিন্নি। দিয়েচ ! সেবার টালিগঞ্জের জমি-বিক্রি করেই তো হোলো।

কর্তা। এবার না হয় টালার বাড়িটাই বেচে দেব। খালিই তো পড়ে আছে।

গিন্নি। [গিন্নির মুখে হাসি দেখা দেয় এতক্ষণে] জমি বেচে পাঁচ হাজার টাকার গয়না হয়েছিল। পূরণো পচা বাড়ির কী আর দাম হবে বলো !

কর্তা। যত কমই হোক না, দশ হাজারের নীচে তো নয়। টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কে জমানোর চেয়ে গয়না গড়িয়ে রাখতেই আমি ভালোবাসি। তা তো তুমি জানো। ব্যাঙ্ক ডুবলে টাকা নিয়ে ডোবে, কিন্তু মানুষ মরলে টাকা রেখে যায়। মেয়েমানুষও গয়না কিছু সঙ্গে নিয়ে যায় না।

গিন্নি। তা না হয় গড়িয়ে দিলে—কিন্তু যেটা গেল ? সেটার তো একটা কিনারা করতে হয়—পুলিশে খবর না দাও, নিজেই একটু চেষ্টা, একটু খোঁজ করলে হোতো না ?

কর্তা। হ্যাঁ, ও আবার পাওয়া গেছে।—

—'যা যায় তা যায় গিন্নি, ফেরে নাকো আর।
তার সাথে আরো কিছু হয় যে ফেরার ॥'

এ আমি অনেকবার দেখেছি। নাহক্ হয়রানি; খোঁজাখুঁজিই খালি সার হবে। [কর্তা নিজের বুড়ো আঙুল নাড়েন]

গিন্নি। তবু যেটা করবার, সেটা তো করতে হয়?

কর্তা। খুঁজবো কি, কে যে নিতে পারে তা আমি ভেবেই পাচ্ছিনে [তিনি ভুরু কোঁচকান্] কার যে এই কাজ!

গিন্নি। কার আবার? মাণিকের। তোমার গুণধর চাকর—সে ছাড়া আর কে? তা বুঝতেও তোমার এত দেরি হচ্ছে? যে-চাকর টেড়ি কাটে সে কি চোর না হয়ে যায়?

কর্তা। মাণিক? না না, সে কি হতে পারে? য্যাদ্দিন ধরে আছে, অতো সরল, অমন বিশ্বাসী, সে চুরি করবে—আমার বিশ্বাস হয় না।

গিন্নি। [রেগে উঠে] সরল বিশ্বাসী? সে করবে না তো কি আমি করেছি?

কর্তা। তুমি? [একটু সন্দিগ্ধভাবে] তোমার জিনিস তুমি চুরি করবে? তা কি সম্ভব? না, এও আমার বিশ্বাস হয় না।

গিন্নি। তাহলে কি তুমি করেছ?

কর্তা। আমি? অসম্ভব।

গিন্নি। তুমিও করোনি, আমিও করিনি, মাণিকও নয়—তাহলে কে করতে গেল শুনি? বাড়িতে তো এই তিনটি প্রাণী।

কর্তা। তাই তো ভাবচি। সেইটাই তো ভাবনার বিষয়। [কর্তার মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে ওঠে] গুরুতর রহস্য তো সেইখানেই।

গিন্নি। তোমার রহস্য নিয়ে তুমি থাকো, আমি চল্লুম। রাঁধতে হবে আমায়। গয়না গেছে ব'লে তো পেট মানবে না। [যেতে যেতে একটু থেমে] তুমি টালার বাড়িটার বিহিত করো এদিকে। তাছাড়া আর কী হবে তোমাকে দিয়ে। তুমি আর কী পারবে!

চোর-ধরা তোমার কম্মো না—তার যা করার আমি নিজেই করব।

কর্তা। মাণিককে যেন কিছু বোলো না। ছেলেমানুষ, মনে ব্যথা পাবে। প্রমাণ নেই, কিছু নেই—মিছে সন্দেহ করলে মুষড়ে পড়বে বেচারা।

গিন্নি। মুষ্‌ড়ে পড়বে? তা কি করতে হয় না হয় আমি বুঝব।

কর্তা। পাড়ার কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও না আঁচ পায়। চুরি যাওয়া একটা কেলেঙ্কারিই কি না?

গিন্নি। অতো টাকার গয়না, একদিন গা সাজিয়ে পরতে পেলুম না। তোমার জন্যেই তো! কেবলি বলেচো, গয়না কি পরবার জিনিস? লোক দেখানোর জন্যে নাকি? বাক্সে তুলে রাখবার জিনিস। এখন হোলো তো, সব নিয়ে গেল চোরে।

কর্তা। সে তোমার ভালোর জন্যেই বলেছি। এক গা গয়না দেখলে পাড়ার লোকের হিংসে হোতো না? পড়শীদের সবার চোখ টাটাতো—সে কি ভালো হোতো?

গিন্নি। বেশ, এবার তবে ওদের কান টাটাক্। আমি ডাক ছেড়ে বলবো আমার কতো টাকার গয়না ছিল, কী কী গয়না চুরি গেছে! বলবই তো!

কর্তা। মাটি করেছে। তাহলেই সবাই জানবে—পুলিশ এসে পড়বে। চুরির কিনারা করবে, আবার সেই ফ্যাসাদ্! না না, ও নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্যটি কোরো না। আজই বরং আমি টালায় যাচ্ছি, বিকেলেই না হয়—

[গিন্নি চলে গেলে কর্তা ফের খবরের কাগজ নিয়ে পড়েন, একটু পরে সদর দরজার থেকে কড়া নাড়ার আওয়াজ আসে। কাগজ ফেলে উঠতে যাচ্ছেন—পাড়ার একদল এসে তাঁকে ছেঁকে ধরে।]

জনৈক। কোথায় গেল সেই বদ্‌মাইস্‌টা ?

কর্তা। [বিচলিত হয়ে] কে ? কে কোথায় গেল ?

২য় জন। আপনার সেই গুণধর চাকরটি ? মাণিকচন্দর্‌ ! চুরি করে পালিয়েছে বুঝি ?

কর্তা। পালিয়েছে ? কই, আমি তো কিছু জানি না। কার চুরি করলো আবার ?

৩য় জন। কার আবার ? আপনারই তো। আর আপনি জানেন না ?

২য় জন। আপনাকেই পথে বসিয়ে গেছে আর আপনিই জানেন না ! বেশ তো।

৪র্থ জন। অবাক্ করলেন মশাই !

কর্তা। আমাকে ? আমায় পথে বসিয়ে ? [বিস্মিত হয়ে] আমি তো তখন থেকে এই ঘরেই বসে আছি।

১ম জন। দেখুন কর্তা মশাই, ন্যাকামো করবেন না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে যাবেন না আর। সব জেনেছি আমরা।

২য় জন। আপনার ঐ-চাকরটি কম নয়। প্রথম থেকেই জানি। যে-চাকর টেড়ি কাটে সে চোর না হয়ে যায় ? সবই আমরা টের পেয়েছি, আপনার গিন্নির থেকে আমাদের গিন্নিরা— আমাদের গিন্নির থেকে আমরা।

১ম জন। কোথায় গেল সেই হতভাগা ? পিটিয়ে তাকে লাশ করবো।

৩য় জন। মেরে তক্তা বানাবো।

৪র্থ জন। পিণ্ডি চট্‌কাবো ওর—

২য় জন। সেইজন্যেই আমরা এসেছি। কোথায় গেল সে ?

কর্তা। দেখুন, সবই যখন জেনেছেন তখন আর লুকোতে চাইনে। কিন্তু একটা কথা। মেরে কী হবে ? মারলে অন্য

অনেক কিছু বেরুতে পারে—যার দৃশ্য কি গন্ধ কিছুই খুব ভালো নয়—কিন্তু গয়না কি বেরুবে?

জনতার একজন। আলবাৎ বেরুবে। বার করে তবে আমরা ছাড়বো।

কর্তা। তাহলেও একটা কথা আছে বলবার। শাস্ত্রের কথা। ঋষিরা বলে গেছেন, ক্ষমা হি পরমো ধর্ম। এবারের মতো ওকে মার্জনা করলে হয় না?

একজন। আপনার চুরি গেছে আপনি ক্ষমা করতে পারেন। আপনার চাকর, আপনি তো মার্জনা করবেনই, কিন্তু আমরা, পাড়রা চারজনা, তা পারিনে। আজ আপনার চুরি করেছে, কাল আমার করবে। পরশু ওঁর করবে, তারপর দিন—

কর্তা। কী মুস্কিল—কী মুস্কিল! তাহলে এক কাজ করুন। আমি বলি কি, আর্ধেক আপনাদের যান শিয়ালদা, আর আর্ধেক হাওড়া। ঐ-ছুটো পথের একটা ধরেই সে সট্‌কেছে এতক্ষণ।

সকলে। দায় পড়েছে আমাদের। কোথ্‌থাও আমরা যাচ্ছিনে। এই পাড়াতেই বসে রইলুম। এখানে বসেই ওর দেখা পাবো—একদিন না একদিন আসতেই হবে বাছাধনকে। আজ না হয় কাল, কাল নয়তো পরশু—যাবে কোথায়? তখন? তখন?? আর একবার যদি এ-পাড়ায় তাকে দেখতে পাই, তখন দেখে নেব কেমন সে! আর দেখবো আপনিই বা কেমন করে ওকে বাঁচাতে পারেন।

[তাদের সকলের প্রস্থান। কর্তা আবার কাগজের মধ্যে
সমাহিত হন, এমন সময়ে মাণিকের আবির্ভাব।]

কর্তা। [কাগজ থেকে চোখ তুলে] কি রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? [সহানুভূতি-ভরা গলায়] সকাল থেকে তো তোকে দেখতে পাইনি।

মাণিক। [একটু আম্‌তা আম্‌তা করে] এই—এই একটু—কুটুম্‌ বাড়ি গেছলাম……[বলেই একটু পরে সে ফোঁস্‌ করে ওঠে] গেছলাম এক স্যাক্‌রার দোকানে।

কর্তা। [একটু অপ্রস্তুত] আহা, কোথায় গেছলি তাকি আমি জানতে চেয়েছি? যাবি বই কি, আত্মীয়-কুটুমের বাড়ি তো যেতেই হয়। একটু না বেড়ালে-টেড়ালে কি চলে? বয়স হয়ে এখন আর পারিনে, নইলে আমিও এককালে খুব মর্ণিংওয়াক্‌ করেছি। রেগুলার।

মাণিক। গিন্নিমা, আমায় যা নয় তাই বদনাম দিচ্ছেন। ফিরে এসে পাড়ায় আর কান পাতার যো নেই—

[রোষে-অভিমানে ফুলতে থাকে চাকর।]

কর্তা। ওর কথা কেউ ধরে? ওর কথা কেউ গায়ে মাখে আবার? মাথার ঠিক নেই তোর গিন্নিমার। তুই কান দিস্‌নে ওসব কথায়, কিচ্ছু মনে করিস্‌নে।

মাণিক। করতুম না, কিন্তু গিন্নিমা আবার পাড়ার বৌদের বলেছেন—বৌদের থেকে ঝিদের মধ্যে কথাটা ছড়িয়েছে, কাণাকাণি জানাজানি হয়ে ঢিঢি পড়ে গেছে চারধারে। ও-বাড়ির ঝি—সে-বাড়ির ঝি—পুঁটি খেঁদি খেন্তি—কারুর জানতে বাকী নেই। পাশের বাড়ির বুঁচিও—! আমি এখন কি ক'রে যে তাকে মুখ দেখাই?

কর্তা। নাই দেখালি! দিনকতক মুখ দেখাদেখি না করলে কী হয়? এমন কিছু আহামরি মুখ নয় কারু। সব তো আমার দেখা। আর, ঝিয়ের মুখ না দেখলে যে ভাত হজম হবে না তাও নয়। আজ না দেখিস্‌, কাল দেখবি। পাড়ার ঝি-রা তো কেউ পালিয়ে যাচ্ছে না!

মাণিক। [আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে] গিন্নিমা বলেছেন—আমি—আমি নাকি—আমি নাকি……

কর্তা। আহা, কে বলেছে? আমি কি বলেছি? বলেছি কি সেই কথা? আমি তো বলিনি? তাহলেই হোলো।

মাণিক। পাড়ার পাঁচজনে আমাকে নাকি পুলিশে দেবে। দিক্ না—দিয়েই দেখুক না একবার!

কর্তা। হ্যাঁ, পুলিশে দেবে। দিলেই হোলো? দেয়া অত সস্তা নয়। অতই সোজা কিনা, দিলেই হোলো পুলিশে। পুলিশ যেন রাস্তায় পড়ে আছে! গড়াগড়ি যাচ্ছে রাস্তায়!

মাণিক। ডাকুক না ওরা পুলিশ—আমি তো দাঁড়িয়েই রয়েছি এখানে। পালাচ্ছিনে।

কর্তা। পুলিশ যেন আমাদের বাবার চাকর—ডাকলেই হাজির! 'আও' বল্লেই আসবে। কেন মিছে ভয় খাস বলতো? আমি রয়েছি কি জন্যে?

মাণিক। ভয় যার খাবার সেই খাবে। আমি কেন ভয় খেতে যাবো? কোনো দোষে দুষী নই, আর আমার নামেই যতো বদনাম! পুলিশ না আসে, আমি নিজেই যাবো থানায়।

কর্তা। [দমে গিয়ে] আরে, তোর কি—তোরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কোথায় পুলিশ, কে দিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে, কেনই বা দিচ্ছে—কিচ্ছু তার ঠিক নেই, হাওয়ার সঙ্গে লড়াই! [একটু থেমে ট্যাঁক্ থেকে একটা টাকা বার ক'রে] নে, বদ্‌নাম দিয়েছে তো কি হয়েছে? গায়ে কি তা লেগে রয়েছে? কথায় কি কারো গায়ে ফোস্‌কা পড়ে? নে, এই বক্‌শিস্ নে—বায়স্কোপ ছাখ গে।

[ঠনাৎ হতেই তৎক্ষণাৎ তুলে নেয় মাণিক]

কিন্তু একটা কথা বলি বাপু! যদি কিছু নিয়েই থাকিস্—সরিয়ে ফ্যাল্ এখান থেকে। এক্ষুনি। রাখিসনে এখানে। একখানাও না। পাড়ার লোকেরা যা আমার, যদিস্যাৎ পুলিশে

জানায়—আর ভুল করে এসেই পড়ে পুলিশ, তখন একটা তালাসি হতে কতক্ষণ ? আর তা হলেই তো হাঙ্গাম !

মাণিক। [ক্ষিপ্ত হয়ে] কী সরাতে বলছেন ? কী নিয়েছি আমি ? নিয়েছি কী ?

কর্তা। আমি কি বলেছি কিছু নিয়েছিস্ ? নিস্‌নি, কিচ্ছু নিস্‌নি। তবু যদি দৈবাৎ—নিজের অজান্তে—কিছু নিয়ে থাকিস্—তোর মনে এমন কোন সন্দেহ জেগে থাকে তাহলে—। আচ্ছা, এক কাজ কর্ না মাণিক ! তোকে আমি তোর গাড়ি ভাড়া এবং আরো কিছু না হয় নগদ দিচ্ছি, তুই এখান থেকে কোথাও পালিয়ে যা না কেন ?

মাণিক। পালাবো ? কেন পালাবো ? কিসের জন্যে ? আমি কি কারু চুরি করেছি যে পালাবো ?

কর্তা। আহা, আমি কি বলেছি পালাতে ? বলছি কোথাও গিয়ে দিনকত গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌না ! কিম্বা কোথাও বেড়াতেই গেলি না হয় ! এই হাওয়া খেতেই—চেঞ্জে-টেঞ্জে কোথ্‌থাও। সিম্‌লে কি শিলং, পুরী কি তারকেশ্বর, নৈনিতাল কি নৈহাটি—কালিম্‌পঙ কি কালীঘাট—এই কাছেপিঠে কোথাও—

মাণিক। কেন যাবো শুনি ?

কর্তা। যায় না কি লোকে ? চুরি না করলে কি যেতে নেই ? আমি যে সেবার টালিগঞ্জের জমিটা বেচেই মথুরা বৃন্দাবন সব ঘুরে এলাম, কেন, আমি কি কারু কিছু চুরি করেছিলাম ?

মাণিক। সে আপনি জানেন !

কর্তা। শোন্ আমি বলি—দেশেও তো যাস্‌নি অনেকদিন ? আমার কথাটা শোন্। মা বাপের জন্যে তোর মন কেমন করে না ? আমি বলি কি—

[তাঁর বলাবলির মধ্যে বাধা পড়ে। 'কর্তামশাই বাড়ি আছেন ?'—সাড়া দিয়েই, সাথে সাথে কতকগুলি ভারী বুটের আওয়াজ কাছিয়ে আসে।]

কর্তা। ছাখ্ তো কে? কারা এলো আবার?

[দেখতে হয় না, জনকত পাহারাওলা নিয়ে খোদ্ দারোগাবাবু স্বয়ং এসে দেখা দেন।]

দারোগা। আপনার নামে গুরুতর অভিযোগ। আপনি নাকি বাড়িতে চোর পুষেছেন?

কর্তা। [আকাশ থেকে পড়ে] চোর! আমার বাড়িতে? বলেন কি মশাই? এসব মিথ্যে গুজব কে রটাচ্ছে বলুন তো? চোর কি আবার কেউ পোষে নাকি? চোর-ছ্যাঁচোর কি পোষবার জিনিস?

দারোগা। আপনার কিছু চুরি যায় নি আজ? গয়নার বাক্স-টাক্স?

কর্তা। গয়নার বাক্স!

দারোগা। চুরির খবর থানায় জানান্ নি কেন তাহলে?

কর্তা। গিন্নি একবার বলছিলেন বটে চুরি না কি—ঐ-ধরণের একটা কথা। কী যেন হারিয়েছে—না খোয়া গেছে—না কী হয়েছে কিন্তু ওঁর তো মাথার ঠিক নেই, তাই কথাটায় আমি কান দিই নি। ওকথা আমার বিশ্বাস হয় না। চুরি আবার কী যাবে—কী আছে আমাদের! কারু এসব কথায় কান দেবেন না। পরের টাকা আর দোষ, সবাই বাড়িয়ে ছাখে মশাই! এই—! (মাণিককে) তুই এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস্? ভেতরে যা, কোনো কাজকর্ম নেই বুঝি বাড়ির?

দারোগা। এটি বুঝি আপনার চাকর? কিরে ব্যাটা, তুই কিছু জানিস্ এই চুরির?

মাণিক। জানি বই কি হুজুর! সবই জানি। চুরি গেছে তাও জানি, কী চুরি গেছে তাও জানি, কার গেছে তাও আমার অজানা নেই—

কর্তা। চোপ্! ভারি বক্তা হয়েছেন! কথা বলতে শিখেচেন খুব! দারোগাবাবু, এর কোনো কথা আপনি ধরবেন না, ছেলে-মানুষ, তার ওপর সকাল থেকে ওর মন খারাপ! মাথার ঠিক নেই। চাকর হয়ে টেড়ি কাটে, দেখছেন না! সিনেমা ছাখে কি না কে জানে! চকোলেটও খায় হয়তো। কি বলতে কী বলে বসবে—কিছু তার ঠিক আছে? ওর কোনো দোষ নেই, বহুদিন থেকে এখানে রয়েছে, আমাদের খুব বিশ্বাসী—ওর ওপর কোনো সন্দেহই হয় না আমার।

দারোগা। কিন্তু, অনেকদিনের বিশ্বাসিতা একদিনেই উপে যায়, লোভ হচ্ছে এম্নি জিনিস! আক্চারই মশাই দেখচি এরকম।

কর্তা। তা দেখতে পারেন। দেখে দেখে বেড়ানোই তো আপনাদের কাজ। কিন্তু একেও আমরা অনেকদিন থেকে দেখচি—

দারোগা। (মাণিককে) এ-চুরি কার কাজ বলে তোর মনে হয়?

মাণিক। আর কারো কাজ নয় হুজুর, আমারি কাজ।

দারোগা। কেন করতে গেলি এমন কাজ?

মাণিক। ঐ তো আপনিই বলেছেন হুজুর! লোভের বশে। কিন্তু লোভ করতে গিয়ে—তেম্নি আক্কেলও হয়েছে আমার। হাড়ে হাড়ে শিক্ষা হয়েছে—

কর্তা। আহা, কী আমার শিক্ষিত চাকর! নিজের কীর্তি নিজেই ঢাক পিটে ফলাও করছেন!

দারোগা। যা জানিস্—সব বল্? কিচ্ছু লুকোস্‌নে—

মাণিক। সবই বল্‌ব আমি, কিচ্ছুটি লুকোবো না। হুজুরের কাছে বলব না তো কার কাছে বলবো?

কর্তা। যা যাঃ! তোকে আর বলতে হবে না। ভারি সব

জানিস। ভারী আমার বক্তা হয়েছেন! অমন করলে তোকে খালাস করে আনাই শক্ত হবে। জামীনই পাবিনে। দারোগাবাবু, ওর কথায় আপনি কোনো কান দেবেন না।

দারোগা। [কর্তার কথায় কান না দিয়ে] চুরি করেছিস্ তো সেসব গয়না গেল কোথায়?

মাণিক। কোথায় আবার! কোথ্থাও যায় নি—আমারই বিছানার তলায় আছে। তেম্নি পুঁট্লি বাঁধা।

দারোগা। নিয়ে আয় তোর পুঁট্লি—

[মাণিক পুঁট্লি আনতে যায়, এক পাহারোলাও যায় তার সঙ্গে]

কর্তা। বলছি না, হতভাগার মাথার ঠিক নেই। আস্ত একটা পাগল! দেখতে পেলেন তো এখন, আমার কথা সত্যি কি না? স্বীকার করবার আর জায়গা পেল না? লালপাগ্ড়ি দেখেছে কি সব ফাঁস করে বসে আছে। বিল্‌কুল্!

[মাণিক ফিরে এসে পুঁট্লি খুলতে সমস্ত গয়না বেরিয়ে পড়ে—
নেক্‌লেস্, ব্রেস্‌লেট্, টায়রা, মফ্‌চেন, তাগা, বালা, চুড়ি,
হার, অনন্ত, সবার অন্ত পাওয়া যায়।
হাতকড়ি লাগানো হয় মাণিককে।]

কর্তা। দারোগাবাবু, আমার একটি অনুরোধ। মিনতিও বলতে পারেন—আপনাদের কাছে। বেচারা নেহাৎ অপোগণ্ড—একেবারে ছেলেমানুষ, লোভের বশে, মুহূর্তের ভুলে, অন্যায় একটা করে ফেলেছে। আপনি ওকে এবারটি মাপ করুন—জীবনের এই প্রথম অন্যায় ওর। বলুন, তা কি মার্জনীয় নয়? অন্যায় কি আমরা করিনে? করিনি কখনো? তবে, ধরা পড়িনি—এই যা। ছেলেবেলার থেকে ও আছে আমাদের কাছে, ছেলের মতই, ওর ওপর আমাদের কোনো রাগ হয় না। তারপর জিনিস যখন সব পাওয়াই গেল—তখন ওকে ধরে নিয়ে জেলে পুরে কী আর হবে

বলুন? এই ওর উঠ্‌তি বয়েস—সুযোগ পেলে এখনো শুধ্‌রে যেতে পারে, কিন্তু এখন যদি ওকে জেলখানায় পাঠানো হয় তবে সেখানে পাকা পাকা চোর ডাকাতের কাছে তালিম পেয়ে এর পরে ওস্তাদ্‌ হয়ে ফিরবে—তখন ওকে সাম্‌লানো শক্ত হবে। আরো বড়ো বড়ো অপরাধ করবে—আর, তার দায়, তার ঝক্কি পোয়াতে হবে, এই আপনাদেরকেই! তাই না?

দারোগা। তা বটে। কিন্তু—

কর্তা। তাই বলছিলাম—আমি বলি কি, এবারটি আপনি ওকে ছেড়ে দিন—ভালো হবার, নিজেকে শোধরাবার, মানুষ হবার সুযোগ দিন ওকে। এবারকার মতো ওকে আপনি মাপ করুন।

দারোগা। আপনি যদি ওর ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেন তাহলে আমি এবারের মত ছেড়ে দিতে পারি—শুধু আপনার কথায়। আর এই এর প্রথম অপরাধ বলেই। কিন্তু এর পরে ফের এমনটি হলে—

কর্তা। সে ভার আমার। আর কক্ষনো হবে না। দারোগাবাবু ধন্যবাদ্‌! অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে—আপনি মহাপুরুষ!

[মাণিককে ছেড়ে দারোগাদের প্রস্থান। গিন্নির প্রবেশ।]

গিন্নি। পুলিসরা গেল সব? চলে গেল? কই, কাউকে তো ধরলো না? ধরে নিয়ে গেল না তো?

কর্তা। কাকে ধরবে? আমাকে নাকি?

গিন্নি। তোমাকে কেন—যাকে ধরবার—

কর্তা। আমাকে তো নয়ই, মাণিককেও ধরলো না। সমস্ত ও স্বীকার করলো—তা সত্ত্বেও। আশ্চর্য্যি! দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই হয়তো, পুলিসরাও সব মানুষ হয়ে গেছে। মহামানব সব! মহাপুরুষও বলা যায়!

গিন্নি। যাক্‌, না ধরেছে ভালোই করেছে—গয়না যখন পাওয়া

গেছে—নাই ধরলো! কিন্তু বাপু, ওকে এখন বিদেয় দাও। অমন চাকরকে আর এ-বাড়িতে ঠাঁই দেয়া—

কর্তা। সেই কথাই আমি বলছিলাম। গয়না তো সব পাওয়াই গেছে—তাই বলছিলাম ওকে—তুই কোথাও চলে যা—বাড়ি যা, তোর গাড়ি ভাড়া দিচ্ছি—নগদও না হয় দিচ্ছি কিছু—দশ বিশ পঞ্চাশ—বাড়ি গিয়ে সৎপথে নতুন করে জীবনযাত্রা সরু কর্‌গে—

গিন্নি। [অবাক্ হয়ে] তুমি ওকে টাকা দেবে আরো?

কর্তা। না দিলে ও যাবে কি করে? বিনা টিকিটে রেল গাড়িতে চাপলে তো আবার সেই পুলিসের ফাঁড়া! থানায় ফাঁড়িতে যেতে হবে। জেলে যাবে আবার।

গিন্নি। যাক্ না, গেলই বা জেলে, তোমার কী? তোমার আদরেই ওর সর্বনাশ হয়েছে। মাথাটি চিবিয়েছো তুমিই ওর! নইলে চাকর কখনো য়্যাতো নেমখারাম হয়? কিন্তু খুব ওর মাথা খেয়েছো—আর কেন? তার চেয়ে ওকে বরং দড়ি-কল্‌সি কিনে দাও, বাড়ি গিয়ে কাজ নেই, গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মরুক্!

মাণিক। সেই চেষ্টাই তো করছিলুম মাঠাকরুণ। দড়ির ভাবনা ছিল না—কর্তা পূজোয় যে পচা জামাটা দিয়েছিলেন তাই পাকিয়েই খাসা দড়ি হোতো, আর কল্‌সি? কল্‌সিতেই যে বাগ্‌ড়া পড়লো। কলসি আর হোলো কোথায়? হতে দিলেন কই? বেশ বড়ো মতন কলসি গড়াতেই তো চেয়েছিলাম, কিন্তু গড়াবার আর সময় পেলাম কই?

গিন্নি। শোনো কথা! তোমার গুণধর চাকরের কথাটা একবার শুনচো!

মাণিক। বেশ ভালো পেতলের কলসিই হোতো গিন্নিমা—[একটু থেমে] আপনার ঐ গয়নাগুলো গলিয়েই হোতো!

যবনিকা

রোমান্স!
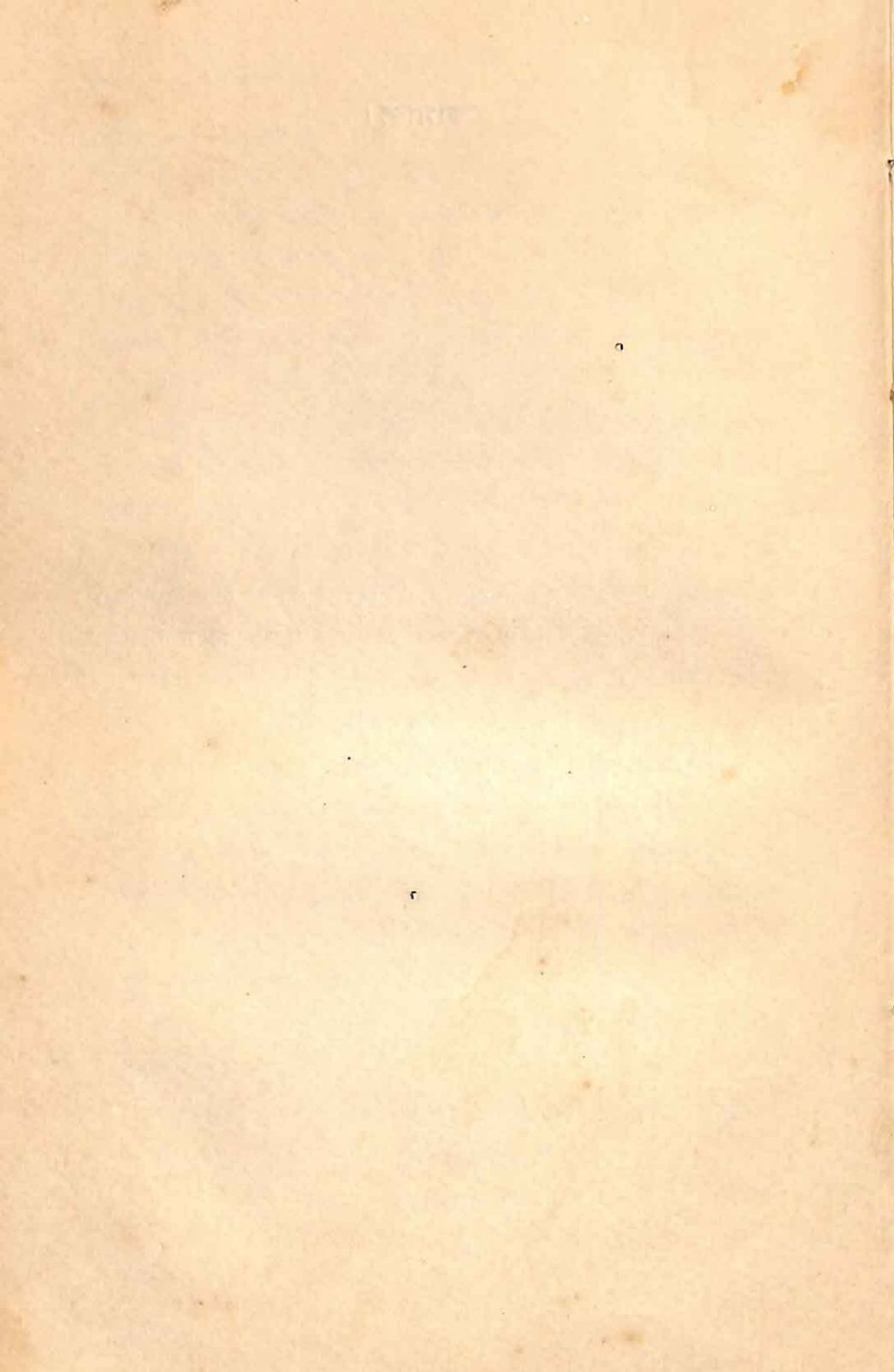
রোমান্স !

সুসজ্জিত বসবার ঘর। ত্রিদিব ও শ্রীলা।

শ্রীলা। মেজমামা, এখনো কি আমি বড় হইনি তুমি বলো? শাড়ি পরচি আমি এখন।

ত্রিদিব। এই সেদিন তো ফ্রক্ ছাড়লি!

শ্রীলা। সেদিন? তিন বছর আগে। মাঝে মাঝে সখ করে পার বটে ফ্রক্, কিন্তু সে তো খালি বাড়িতেই! বাইরে বেরুলে আমি—

ত্রিদিব। এসব ছবি তোমাদের দেখবার মতো নয় শ্রীলা! হলে কি আমি আর নিয়ে যেতুম না? টার্জানের কি লরেল-হার্ডির ছবি হলে তো—

শ্রীলা। আমার কেলাসের সব মেয়েই তো 'অ্যাডাল্ট্স্ ওন্লি' ছবি দ্যাখে—

ত্রিদিব। ছেলেরা কি 'লেডিজ্ ওনলি' সীটে গিয়ে বসে না? কিন্তু সেটা কি উচিৎ? এসব রোমান্টিক ছবি তোমাদের দেখতে নেই—

[ব্যস্তভাবে কৃষ্ণার প্রবেশ]

বাব্বাঃ, এত দেরি হোলো তোমার আসতে? পাঁচটা যে বাজে! ভেবেছিলাম কোনো রেস্তরাঁয় কিছু খেয়ে নিয়ে তারপরে আমরা সিনেমায় যাবো।

কৃষ্ণা। তুমি তৈরী তো ত্রিদিবদা? তাহলে আর দেরি কিসের? বেরিয়ে পড়া যাক্।

শ্রীলা। মেজমামা, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে—

ত্রিদিব। [একটু কঠোর ভাবে] ছিঃ, শ্রীলু! অমন করে না।

[ত্রিদির ও কৃষ্ণার প্রস্থান]

শ্রীলা। আমাকে নিয়ে যাওয়া হোলো না সিনেমায়। বেশ! আমি যেন আর বড়ো হইনি! বড় হতে কী বাকী রয়েছে আমার? সব জানি, সব বুঝি আমি। এখনো কচি খুকীটি আছি নাকি? রোমান্টিক বই বুঝি দেখতে নেই আমাদের! রোমান্স কাকে বলে জানিনে যেন আমি! কৃষ্ণাদিকে নিয়ে সেজেগুজে যাওয়া হোলো সিনেমায়—এটা বুঝি রোমান্স নয়? নিজেরা দুটিতে হাত-ধরাধরি করে বেরুলেন—মজা করে ছবি দেখবেন, পটাটো-চিপ্‌স্ খাবেন, হেসে গড়িয়ে পড়বেন—এসব বুঝি রোমান্স নয়? আমি বুঝি আর বুঝতে পরিনে? কেবল আমার বেলাতেই যতো—!

[জানালার কাছে গিয়ে]

ঐযে যাওয়া হচ্ছে হেলতে দুলতে। পাশাপাশি—একেবারে ঘেঁষাঘেষি। এই—এ যদি রোমান্স না হয়, তবে রোমান্স কাকে বলে শুনি?

আচ্ছা, ঐ ভদ্রলোকটি কে? রোজ এই সময়ে ওভারকোট গায়ে এই রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যান। কী রকম লম্বা চৌড়া—আর কী চমৎকার দেখতে! কোথায় থাকেন উনি? মনে হচ্ছে এই রাস্তার কোণের ঐ গলির মধ্যেকার হলদে বাড়িটাতেই! পাশের বাড়ির বাঁশরীর কাছে খবর নিতে হবে। ওর সঙ্গে কেউ আমায় আলাপ করিয়ে দেয় না?

[শ্রীলা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললো।]

কেন, আমি নিজেই তো আলাপ করতে পারি। গায়ে পড়ে আলাপ করলে মান যায় নাকি! পারিনে? অচেনা যুবকের সঙ্গে মিশতে নেই কি মেয়েদের?

দাঁড়াও, করছি এখুনি আলাপ—এইতো, আমাদের বাড়ির তলা দিয়েই যাচ্ছেন এখন—

[তারস্বরে] হেল্‌প ! হেল্‌প !! খুন—জখম—রাহাজানি ! কে কোথায় আছো রক্ষা করো !

[তারপরে নিজের পরণের শাড়িটা অবিন্যস্ত করে ব্লাউজের খানিকটা ছিঁড়লো আর চুলগুলো এলেমেলো করে দিল।]

এবার ? এবার কি ? রোমান্টিক বই দেখতে নেই তো আমাদের ? এখন ? এখন যে আমি ঘরে বসে রোমান্স করছি—চাইকি, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা সিনেমা দেখতেও যেতে পারি আজ—যদি তেমনধারা আলাপ জমে···জমাতে পারি যদি—

[নেপথ্যে পদশব্দ শুনে অসহায়ের মত শোফায় এলিয়ে পড়লো। ওভারকোট গায়ে ভদ্র যুবকের প্রবেশ]

যুবক। কই ? খুনে ডাকাতরা সব গেল কোথায় ?

শ্রীলা। আপনার পায়ের আওয়াজ পেয়েই পালিয়ে গেল এইমাত্র।

যুবক। কি করে পালাবে ? সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে দেখলাম না তো কাউকে !

শ্রীলা। বোধহয় ওধারের দেওয়ালের নল বেয়ে নেমে গিয়েছে।

যুবক। ক'জনা ছিলো ? নিতে পেরেছে কিছু ?

শ্রীলা। একজন মোটে ! নিতো হয়তো, কিন্তু নেবার সময় পেল কোথায়, আপনি এসে পড়লেন—

যুবক। তবু ভালো। কিচ্ছু না বলে—না নিয়েই পালিয়েছে। মনে হচ্ছে, খুন-খারাপির তার মৎলব ছিল না—

শ্রীলা। না, আমাকে খুন করার তার উদ্দেশ্য ছিল না। এখন তাই মনে হচ্ছে ! খুন করার চেয়েও খারাপ কোনো মৎলব ছিলো আমার মনে হয়। আপনি এসে আমাকে—আমাকে উদ্ধার

করেছেন। লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন আমায়। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

যুবক। [একটা আরাম কৌচে আসন নিয়ে] ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি আসবার আগেই বদমাসটা পালিয়েছে—নইলে—

শ্রীলা। নইলে আপনার হাতে তার রক্ষা ছিল না নিশ্চয়।

যুবক। নইলে কী হোতো তা কে জানে! ভাবতেও আমি শিউরে উঠছি। বদ্‌লোকের সঙ্গে হাতাহাতি করতে আমার ভালো লাগে না। পারিও না আমি।

শ্রীলা। কার বা ভালো লাগে! আপনাকে এক পেয়ালা চা করে দিই—

[ইলেক্‌ট্রিক স্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে]

আপনার ওভারকোটটা খুলে আরাম করে বসুন না। ঘরের মধ্যে তো তেমন ঠাণ্ডা নেই।

যুবক। তা নেই, কিন্তু…কিন্তু না, থাক! ওটা গায়ে থাকলে একটু স্বস্তিতে থাকা যায়।

শ্রীলা। সঙ্কোচের আপনার কোনো কারণ নেই। বাড়িতে এখন আমি ছাড়া কেউ নেইকো আর। একলা আমি। মামা তাঁর এক বন্ধুনীকে নিয়ে সিনেমায় গেছেন। বাচ্চা চাকরটাও টো-টো করতে বেরিয়েছে রাস্তায়।

যুবক। রবিবারের ছুটির দিন তো, কাজের তাড়া নেই কারো!

শ্রীলা। রোজ বিকেলে আপনাকে দেখি আমি এই পথ দিয়ে যেতে—ওভারকোট গায়ে দিয়ে—

যুবক। বেশিদিন তো আসিনি এ পাড়ায়। পৌষের গোড়ার থেকে আছি। এই তো সেদিন বার্মার থেকে এলাম—

শ্রীলা। বার্মা! বার্মায় আপনি কী করতেন?

যুবক। বার্মিজ সৈন্যবিভাগে ডাক্তারির চাকরি। সেখানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে এখন ঘোরতর লড়াই হচ্ছে জানেন বোধ হয়? ইস্—এই যুদ্ধের কাজ! এত বিচ্ছিরি যে বলা যায় না। জীবন বরবাদ করে দেয়।

শ্রীলা। [দু চোখ বড়ো করে]। আপনি ডাক্তার? ডাক্তারদের আমি খুব ভালোবাসি!

যুবক। [ভালোবাসার কথাটায় একটু সচকিত হয়ে]। কী—কী বল্লেন?

শ্রীলা। মানে, একবার এক ডাক্তার আমাকে টাইফয়েড থেকে বাঁচিয়েছিলেন কিনা—আর আজ—আজ আপনি বাঁচালেন। তাই ডাক্তারদের আমার খুব ভালো লাগে! ভারী ভালো তারা।

যুবক। ধন্যবাদ! সমগ্র ডাক্তারজাতির পক্ষ থেকেই ধন্যবাদ আপনাকে।

শ্রীলা। আপনাকেও আমার ধন্যবাদ, সমগ্র নারীজাতির পক্ষ থেকেই।

যুবক। নাড়ি নিয়েই তো কারবার আমাদের। মানে, ডাক্তারদের। তবে ও-কাজ এখন আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। কারো নাড়ি টেপার আর ভরসা হয় না!

শ্রীলা। নিন, চা খান।

[চা দিতে গিয়ে, কৌচের হাতলের উপর বসলো]

আপনার চুলগুলি তো বেশ—দিব্যি কোঁকড়ানো। হাত দিতে লোভ হয়।

যুবক। দিতে পারেন হাত। লোভ সম্বরণের দরকার নেই। এ মাথা এখন—এখনো বেওয়ারিশ। যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে।

শ্রীলা। দেব—দেব একটু হাত ?

যুবক। স্বচ্ছন্দে। মেয়েদের হাত তো মাথায় করে রাখবারই জিনিস। আর, সত্যি বলতে, ছেলেদের মাথায় হাত বোলাবার জন্মই তো মেয়েরা।

শ্রীলা। [যুবকের চুলগুলি এলোমেলো করে দিতে দিতে—হঠাৎ] আচ্ছা আজ একটা সিনেমায় গেলে হোতো না ? আপনি আর আমি—দু'জনে ?

যুবক। সিনেমা ? সে কি করে হয় ? আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। একেবারে অচেনা একজন লোকের সঙ্গে—

শ্রীলা। কেন, এই যে আমাদের আলাপ হোলো ! এখনো কি আমরা অচেনা ? তা-ছাড়া, আপনি তো আমাদের পাড়ারই একজন।

যুবক। তা বটে। কিন্তু তাহলেও আপনার মামার সঙ্গে আলাপ হওয়া দরকার। তাঁর অনুমতি নেয়ার দরকার আগে।

শ্রীলা। মামা টের পেলে তো ? তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পাবেন না। তাঁদের আগেই আমরা বাড়িতে এসে যাবো।

যুবক। যদি তা না হয় ? দেরী হয়ে যায় যদি ? সব সিনেমা এক সঙ্গেই ভাঙবে তো ?

শ্রীলা। তাহলে চলুন, এমনিই একটু ঘোরা যাক—সাদার্ণ এভিনিউ ধরে বেড়িয়ে আসি একটু—

যুবক। আর বাড়ি ? এই বাড়ি আগলাবে কে ? খালি পড়ে থাকবে এমনি ? যদি চুরি ডাকাতি কিছু হয়ে যায় এই ফাঁকে ? সেই বদমায়েস লোকটা যদি ফের ফিরে আসে ?

শ্রীলা। তা হলে—তা হলে এই বাড়িতেই বেশ। বসে বসে গল্প করা যাক। কেমন ? মামার না আসা পর্যন্ত। আপনার হাতঘড়িতে—কটা এখন, দেখি তো ? আপনার কব্জি নিশ্চয়ই খুব চওড়া ?

যুবক। (একটু সঙ্কুচিত হয়ে) হাতঘড়ি? হাতঘড়ি আমার নেই। কবে যে বেহাত হয়ে গেছে!

শ্রীলা। [স্বগত] অদ্ভুত লোক তো! হাতঘড়ি না থাক হাত তো রয়েছে? একটি তরুণী যদি গায়ে পড়ে কৌচের হাতলে পাশটিতে এসে বসে তাহলে তাকে যে তখন···আরে, চা যে জুড়িয়ে গেল তাও কি হুঁস্ নেই লোকটার? আচ্ছা, বইয়ে আর ছবিতে যে এত রোমান্সের গল্প থাকে তার একটাও কি ইনি পড়েন নি, না ছ্যাখেন নি?

[নেপথ্যে কতকগুলি ভারী পায়ের আওয়াজ হতেই শ্রীলা চট করে উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়, যুবকটিও খাড়া হয়। পুলিস কনস্টেবল আর দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের অনুপ্রবেশ]

পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। এই মেয়েটির চীৎকার পাশের বাড়ি থেকে শুনেই আমি লালবাজারে ফোন করে ছিলাম—খুন, জখম্, রাহাজানি বলে চেঁচাচ্ছিলো মেয়েটি। ঠিক সময়েই আপনারা এসে পড়েছেন।

দারোগা। এই কি সেই দুর্বৃত্ত? কিন্তু ভদ্রলোকের মতন চেহারা দেখছি! অবিশ্যি, চেহারা আর পোষাক দেখে কিছুই আজকাল মালুম হবার যো নেই। [মেয়েটিকে শুধান] এই—এই লোকটি কি আপনাকে খুন করতে এসেছিলো?

[শ্রীলা ব্যাপার দেখে একেবারে থ। তার মুখে কোনো কথা নেই।]

পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। খুন করতে কেন মশাই, অন্য মৎলবে। কোনো কুমৎলবেই। দেখছেন না মেয়েটি লজ্জায় কথা কইতে পারছে না। ওর অবস্থাটা একবার চেয়ে দেখুন। আলুথালু চুল, কাপড় অগোছালো, ব্লাউজ ছেঁড়া—

দারোগা। বুঝেচি। [যুবকের প্রতি] এ বিষয়ে আপনার কিছু বলবার আছে ?

যুবক। এ ব্যাপারে কোনোখানেই আমার কোনো হাত ছিল না—এইটুকুই শুধু আমার বলবার।

দারোগা। হাত ছিল না ? বটে, ছিল কিনা তা এখুনি টের পাবে। কিক্কড় সিং, করছো কী ? লাগাও হাতকড়ি। উতারো ইস্‌কা কোট।

[ওভারকোট খুলে ফেলতেই—দেখা গেল যে যুবকের দুটি হাতই কাঁধ থেকে কাটা! সেই দৃশ্য দেখে শ্রীলা চীৎকার করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।]

যুবক। [দারোগাকে] দেখুন, যা বল্লাম সত্যি কিনা ? এমন কি, ওঁর এই মূর্চ্ছাতেও আমার কোনো হাত নেই।

যবনিকা

সম্পাদকের বিপদ
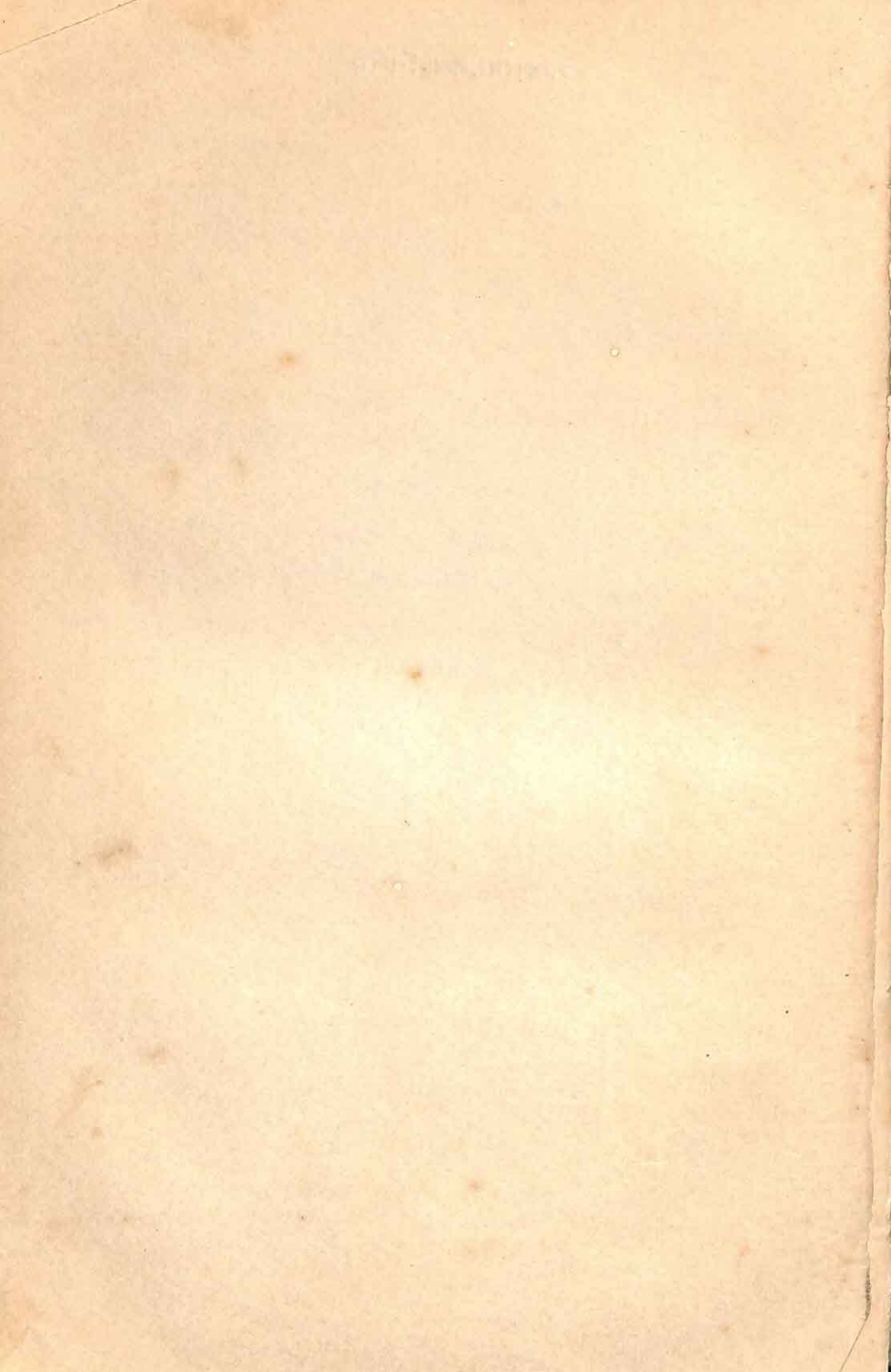
সম্পাদকের বিপদ

প্রথম দৃশ্য

কৃষিতত্ত্ব মাসিকের কার্যালয়। সম্পাদকের ঘর। প্রুফ-রীডার বসে বসে প্রুফ দেখছিল। সম্পাদক এলেন।

সম্পাদক। আজকের ডাকে কী কাগজ-পত্র এল দেখি?

প্রুফ-রীডার। [দরজার কাছে গিয়ে নেপথ্যে লক্ষ্য করে] বেয়ারা ডাকবাক্সে যা এসেছে নিয়ে এসো—জল্‌দি।

বেয়ারা। [নেপথ্য থেকে] আজ্ঞে—যাই—

সম্পাদক। কেউ কি আজ দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে?

প্রুফ-রীডার। হাঁ, একটু আগে একজন—

সম্পাদক। বিস্কুটের টিনটা পাড়ো তো দেখি।

[প্রুফ-রীডার টিনটা এনে এগিয়ে দিল। বেয়ারার কাগজ-পত্রসহ প্রবেশ। কাগজ-পত্রগুলি টেবিলের উপর রেখে—]

বেয়ারা। একজন লোক দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন।

সম্পাদক। ভদ্রলোক,—না,—লেখক?

বেয়ারা। ভদ্রলোক বলে তো মনে হয় না।

সম্পাদক। তাহলে লেখক—নিঃসন্দেহই। আচ্ছা, অপেক্ষা করতে বলো। আর দারোয়ানকে বলে দাও—না, এখুনি দারোয়ানকে কিছু বলার দরকার নেই—লোকটাকে আমাদের কয়লার কুঠরিতে বসতে দাও—

বেয়ারা। যে আজ্ঞে—

সম্পাদক। আর তুমি বাইরে গিয়ে রাস্তার মোড়ে পুলিশ-টুলিশ আছে কিনা দেখে আসবে—চট্ করে। বুঝেছ?

বেয়ারা। যে আজ্ঞে— [প্রস্থান

প্রুফ-রীডার। পুলিশ! পুলিশ কী হবে মশাই?

সম্পাদক। যা দিনকাল পড়েছে। পুলিশ পাহারা কাছাকাছি আছে কিনা জেনে রাখা ভালো। এখনকার লেখকরা বোমা নিয়ে হাজির হতে পারে। অবশ্যি, লেখকরা চিরদিনই বোমা নিয়ে আসে, কিন্তু সে হোলো লেখার বোমা। এখন যদি সেই সাথে আবার আসল বোমাও আমদানি করে! একটু যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে চা-বিস্কুট খাবো তারো জো নেই।

প্রুফ-রীডার। ভারী দায়িত্বজনক কাজ এই সম্পাদক হওয়া।

সম্পাদক। দায়িত্ব বলে! বলে—প্রাণ নিয়ে টানাটানি! তার ওপরে কৃষিতত্ত্ব মাসিকের সম্পাদকতা করা চাট্টিখানি না।

প্রুফ-রীডার। সত্যি! লেখা পড়তে,—প্রুফ দেখতেই যা কষ্ট হয়—না জানি লিখতে আরো কতো না!

সম্পাদক। ঠিক বলেছো। এই যেমন, এ মাসের আমার সম্পাদকীয়—কৃষিকর্মে মানুষের জন্মগত অধিকার—

প্রুফ-রীডার। নামটা একটু লম্বাটে হয়ে গেছে—না?

সম্পাদক। বেশ, তা হলে জন্মগত কৃষিকর্ম করে দেব না হয়—

বেয়ারা। [প্রবেশ করে] লোকটা কয়লার ঘরে থাকতে রাজি হচ্ছে না। বলছে ভারী ইঁদুর।

সম্পাদক। ভারী ইঁদুর! তা, হাল্‌কা ইঁদুর এখন আমি কোথায় পাবো? আচ্ছা লোক তো! আচ্ছা, যাও—নিয়ে এসো গে। কিন্তু দেখো, ইঁদুরগুলো যেন ওর পিছনে পিছনে না আসে। ইঁদুর ছাড়িয়ে আনবে, বুঝেছ?

বেয়ারা। যে আজ্ঞে— [প্রস্থান

সম্পাদক। হ্যাঁ, যা বলছিলাম! এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা লিখতে কি আমাকে কম মেহনৎ করতে হয়েছে? কম বই-পত্তর ঘাঁটতে হয়েছে—তারপর এই শরীর নিয়ে—শরীরে এই বেরিবেরি নিয়ে—

প্রুফ-রীডার। অসুখটা পুষে রাখছেন কেন! সারিয়ে ফেলুন না—

সম্পাদক। সারাবো তো মনে করি, কিন্তু সময় কই! ডাক্তার তো কবে থেকে বল্‌ছেন চেঞ্জে যেতে। গিরিডিতে যাবো, গিয়ে থাকবো মাসকতক। কিন্তু এই দুরূহ কাজের ভার—আমার মাসিকের দায়—এর সম্পাদকতা কার ঘাড়ে চাপিয়ে যাই। সেই তো হয়েছে সমস্যা।

[লেখকের প্রবেশ]

এই যে, আপনিই বুঝি অপেক্ষা করছিলেন? কী দরকার বলুন তো—সংক্ষেপে সারুন।

লেখক। আজ্ঞে, একটা লেখা এনেছিলাম। আমার নাম অমর বসু। অমর নামটা আপনার একেবারে অজানা নয় আশা করি।

সম্পাদক। না। লেখকরা অমর, অনেকদিন থেকেই শুনছি। তাছাড়া আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তাই। মেরে-ধরে কিছুতেই ওদের শেষ করা যায় না। লেখক অমর—অফুরন্ত। তা, কী বল্‌ছিলেন? লেখা এনেছেন? আপনার নিজের লেখা?

লেখক। কারো নকল করা কিনা জানতে চাইছেন? আজ্ঞে না, আমার নিজের লেখা—আমি নিজেই নকল করেছি। একখানা উপন্যাস।

সম্পাদক। [লাফিয়ে উঠলেন] উপন্যাস কী সর্বনাশ! আপনি তো ভয়ঙ্কর লোক! এই ভরদুপুরে উপন্যাস নিয়ে এভাবে আমাকে আক্রমণ করবার মানে?

লেখক। আমার উপন্যাস অন্যান্য কাগজেও বেরিয়েছে, তাই ভাবলাম, আপনার বিখ্যাত মাসিকেও—

সম্পাদক। আমার ইচ্ছে করছে এক্ষুনি আপনার গলা টিপে ধরি। আত্মরক্ষার খাতিরে তা করলে অন্যায় হয় না—আইনে সে অধিকার দেয়।

লেখক। না না—আমি চলে যাচ্ছি ; গলা টিপবেন না। আমি কোনো অসদুদ্দেশ্যে এখানে আসি নি। খাতাটা দিন, আমি চলে যাই।

সম্পাদক। খাতা দেব, বটে! ওসব চালাকি এখানে চলবে না। যখন দিতে এনেছেন—তখন দেয়া হয়ে গেছে। লেখাটা আমি পড়ে দেখবো—বেয়ারা!

[বেয়ারার প্রবেশ]

ভদ্রলোককে সেই কয়লার ঘরে নিয়ে যাও। ইঁদুরদের কোনো আপত্তি শুনো না। ততক্ষণে আমি ওঁর লেখাটা পড়ে দেখি। দারোয়ানকে বলে দাও যেন কড়া নজর রাখে—ইনি একজন লেখক।

বেয়ারা। যে আজ্ঞে—

[উভয়ের প্রস্থান

সম্পাদক। বেয়ারা!

বেয়ারা। [ফিরে এসে] আজ্ঞে বলুন—

সম্পাদক। দেখো, যেন চা-টা না দেয়া হয়—

বেয়ারা। যে আজ্ঞে— [প্রস্থান

সম্পাদক। [খাতাখানি হাতে নিয়ে] গুপ্তধনের ব্যক্ত কথা—অ্যাড্‌ভেঞ্চারমূলক উপন্যাস! উপন্যাস কিনা কে জানে, কিন্তু মূলক যে, তার ভুল কী!

প্রুফ-রীডার। আজকাল সব লেখাই অ্যাড্‌ভেঞ্চার। সমস্তই আপনার মূলক।

সম্পাদক। ভেবে দেখলে, লেখাটা কি একটা কম অ্যাড্‌ভেঞ্চার নাকি! তুমি কখনো কিছু লিখেছো-টিখেছে? সাহিত্য-টাহিত্য?

প্রুফ-রীডার। আজ্ঞে না, তবে এই প্রুফ দেখাটাকে যদি সাহিত্য করা বলে ধরেন তাহলে—

সম্পাদক। প্রুফ-সাহিত্য? মন্দ কি? এই রকম সাহিত্য-

প্রুফ হওয়াই সবচেয়ে ভালো এবং নিরাপদ। এ রকমের লোকই আমি পছন্দ করি। মিশতে কোনো ভয় করে না। [বিস্কুটে কামড় দিয়ে] কদ্দূর পড়েছো তুমি ?

প্রুফ-রীডার আজ্ঞে, বেশি না।

সম্পাদক। তাহলে তো লেখক হবার যোগ্যতা ছিল হে! এমনকি, সম্পাদকও হতে পারতে। সম্পাদক হতে ইচ্ছে করে ?

প্রুফ-রীডার। আজ্ঞে না, মাপ করবেন।

সম্পাদক। দিনকতকের জন্যে হয়ে দেখতে। সেই সময়টা আমি না হয় গিরিডি গিয়ে হাওয়া বদলে আসতুম।

প্রুফ-রীডার। আজ্ঞে সম্পাদক হওয়া ভারী ঝক্‌মারি—লেখকের ঝামেলা—

সম্পাদক। যা বলেছো—

[একজনের প্রবেশ]

কী চাই ?

সেই ব্যক্তি। আপনি—আপনিই কি সম্পাদক ? আমি—আমি একটা—লেখা এনেছিলাম—আমি—

সম্পাদক। দেখি লেখাটা—[প্রুফ-রীডারকে] ওহে, তুমি ততক্ষণ উপন্যাসখানা পড়ে ছাখো তো—[খাতাটা তাকে দিলেন।]

২য় লেখক। একটা গল্প। একেবারে নতুন ধরনের—পড়লেই আপনি টের পাবেন।

[সম্পাদক গল্পটা হাতে নিলেন। একটু চোখ বুলোতেই তাঁর কপাল কুঞ্চিত হোলো, ঠোঁট বেঁকে গেল, নাক সিঁটকালো, দাড়িতে হাত পড়ল,—যতই তিনি এগুতে লাগলেন ততই তাঁর চোখ-মুখের চেহারা বদ্‌লাতে লাগলো। এদিকে প্রুফ-রীডার ততক্ষণে খাতাখানাকে গজ-ফিতা নিয়ে মাপতে লেগেছে। অবশেষে লেখা-পড়া শেষ করে সম্পাদক একটু হতভম্ব হয়ে রইলেন।]

২য় লেখক। কীরকম লাগলো ?

সম্পাদক। লাগলো ? তা রীতিমতই ! যা লিখেছেন তাতে না লেগে পারে ? মন্দ লাগেনি। তবে এটা যে গল্প তা জানা গেল লেখার মাথায় আপনি ব্র্যাকেটের মধ্যে কথাটা লিখে দিয়েছেন বলে—নতুবা বোঝার আর কোনো উপায় ছিল না।

২য় লেখক। তা বটে। আপনারা—সম্পাদকরা যদি দয়া করে ছাপেন তবেই নতুন লেখক আমরা উৎসাহ পাই। তা আপনি যখন বল্‌ছেন···আপনার বেশ লেগেছে বল্‌ছেন যখন···

সম্পাদক। তা এটা কি—

২য় লেখক। হ্যাঁ, অনায়াসে। আপনার কাগজের জন্যেই আন—

সম্পাদক। আমার কাগজের জন্য ! তা আপনি কি এর আগে আর কোথাও লিখেছেন ?

লেখক। [ঈষৎ গর্বের সহিত] নাঃ। এই আমার প্রথম লেখা —আমার প্রথম চেষ্টা।

সম্পাদক। প্রথম চেষ্টা ? বটে ? [একটু ঢোঁক গিলে] আপনার হাতঘড়িটা তো একটু অদ্ভুত আকারের দেখছি !

লেখক। হ্যাঁ। দেখতে একটু ঢাউস্—আমেরিকান ঘড়ি। নামজাদা, কিন্তু হলে কী হবে রোজ দশ মিনিট করে লেট যায়।

সম্পাদক। রোজ দশ মিনিট স্লো ? তাহলে বোধ হয় জেকো-শ্লো-ভাকিয়ার হবে। দেখি, আপনার ঘড়িটা। দেখি তো, দুরস্ত করতে পারি কিনা।

লেখক। ঘড়ি মেরামতও জানেন নাকি আপনি ?

সম্পাদক। জানি বলেই তো আমার ধারণা। দেখি, কিছু করতে পারি কিনা।

লেখক। আহা, দিন্ না এটা রেগুলেট্ করে—তাহলে তো বেঁচে যাই। [হাতঘড়িটা খুলে সম্পাদককে দিল।]

সম্পাদক। ব্যাগটা আপনি রাখুন, শুধু ঘড়িটাই আমাকে দিন্।
[প্রুফ-রীডার কাছে এসে দাঁড়ালো] কী! কিরকম দেখলে বইটা?

প্রুফ-রীডার। আজ্ঞে, হ্যাঁ। দেখলাম। দেড়শো ফুট হবে। মাপজোক করে দেখলাম।

সম্পাদক। বাব্বা! দেড়শো ফুট লেখা! শব্দসংখ্যা?

প্রুফ-রীডার। আন্দাজী গোনা—তাহলেও সাত হাজারের ওপর।

সম্পাদক। বাপ্স্! পড়ে দেখেছো?

প্রুফ-রীডার। ওপর ওপর চোখ বুলিয়েছি।

সম্পাদক। কিরকম? কমা-সেমিকোলনের কোনো ভুল-টুল নেই?

প্রুফ-রীডার। আজ্ঞে, ও বালাই নেই। বেশির ভাগই ডট্…
…ডট্ই বেশি।

সম্পাদক। আর বানান টানান? ঠিক আছে তো?

প্রুফ-রীডার। কদ্দূর মনে হয়?

সম্পাদক। মোটের ওপর বইখানা কেমন?

প্রুফ-রীডার। আমার তো ভালোই লাগলো?

সম্পাদক। হাসির ব্যাপার-ট্যাপার কিছু নেই তো? হাস্যরস যাকে বলে—সেই বস্তু?

প্রুফ-রীডার। একদম্ না।

সম্পাদক। তাহলে ভালো। আমার পাঠকদের আমি হাসাতে চাই না। কৃষিতত্ত্বের কাগজ, বুঝছো তো? কৃষিতত্ত্ব পড়ে হাসবে, সেটা আমার অপমান! কিন্তু আজকালকার পাঠকদের রুচি এমনি যে হোমিওপ্যাথির কাগজেও গল্প চায়। তাদের মর্জি অনুসারেই মনে করছি এবার থেকে মাঝে মাঝে এক-আধটা গল্প দেব। আর যদি সেই সঙ্গে একখানা উপন্যাসও ধারাবাহিক দেয়া যায়—

প্রুফ-রীডার। বড্‌ডো ভালো হয়।

সম্পাদক। আচ্ছা, বলো দেখি, বইটার মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা যা পড়লে গায়ে ঘাম দেয়, শরীরে রোমাঞ্চ জাগে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বইতে থাকে, কখনও কখনও বা রুদ্ধ হয়ে আসে, গলা শুকিয়ে যায়, বুকের মধ্যে···বুকের মধ্যে ভূমিকম্প হতে থাকে? এক কথায়, বইটার আগাপাশতলা অ্যাড্‌ভেঞ্চার কিনা সেই কথাই আমি জানতে চাইছি।

প্রুফ-রীডার। আজ্ঞে, তাই। ভয়ঙ্কর রকম।

সম্পাদক। তাহলেই হবে। যাও, এবার লেখককে পাকড়ে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, পেনসিল-কাটা ছুরিটা দিয়ে যাও তো। ঘড়িটাকে সারি।

[খাতা রেখে, ছুরিটা এগিয়ে দিয়ে প্রুফ-রীডার প্রস্থান করল।]
ঘড়িকে সারতে হলে প্রথমে এর কলকব্জা সব দেখা দরকার। আর সে-সমস্তই এর ভেতরে। আগে এর ডালাটা খুলতে হবে—

[ঘড়িটা দু-একবার টেবিলের উপর ঠুকলেন, তাতে ডালা খুল্‌লো না দেখে, পেন্‌সিল-কাটা ছুরিটার চাড়া লাগালেন—চড়াৎ করে শব্দ হয়ে ডালাটা খুলে গেল।]
ইস্! গোটা ডালাখানাই খুলে এলো যে! চম্‌কাচ্ছেন কেন? ঘাবড়াবেন না। জুড়ে দেব আবার, ভয় কী?

[প্রুফ-রীডার প্রথম লেখককে নিয়ে প্রবেশ করলো। লেখকটি ভারী দমে গেছে মনে হয়। সম্পাদক তখন ঘড়ি রেখে লেখকের খাতাটা নিয়ে ওল্‌টাতে লাগলেন।]
আপনার বইটা আমরা নেব, স্থির করেছি।

১ম লেখক। পছন্দ হয়েছে আপনার?

সম্পাদক। পছন্দ-অপছন্দের কথা নয়, নেব। কিন্তু কয়েকটা সর্ত আছে। এর জায়গায় জায়গায় এক-আধটু অদল-বদল করতে হবে।

১ম লেখক। অ্যা ?

সম্পাদক। হ্যাঁ। সে আমরাই করে নেব। প্রথম, এর নামটা আমার মনঃপূত নয়। কী নাম এটার ? 'গুপ্তধনের ব্যক্ত কথা' ? নামটা তেমন যুত্‌সই হয়নি। ওর বদলে আমি 'আর্তনাদের বিভীষিকা' রাখতে চাই।

১ম লেখক। কিন্তু তাহলে কি—[হাত কচলাতে লাগলো]।

সম্পাদক। বাধা দেবেন না। নাম ছাড়াও আরো আপনার গল্পটা বড্‌ডো বড়ো। দেখি কাঁচিটা—[প্রুফ-রীডার কাঁচি এগিয়ে দিল] সাত হাজারের ওপর শব্দ আছে এতে—অথচ আমাদের কাগজে উপন্যাস চালাতে হলে চার হাজারের বেশি কথা আমরা দিতে পারি না। অতএব কিছুটা এর বাদ দিতে হবে।

১ম লেখক। কী সর্বনাশ···তা হলে আমার থাকবে কী !

সম্পাদক। আপনার নাম। আসল জিনিসটাই থাকবে। আপনার নামটা আমরা কাটতে চাই না।

১ম লেখক। আমার নাম !

সম্পাদক। হ্যাঁ, নাম। নামের জন্যেই তো লেখা। [কাঁচি চালিয়ে খাতাটাকে দু-আধখানা করে] এই নিন—এই শব্দগুলো। এগুলোয় আমাদের দরকার নেই। আপনি রেখে দিতে পারেন—এর ওপরে কোনো দাবী-দাওয়া 'নেই আমাদের। অন্য কোনো কাগজে দিতে পারেন বা আপনার অন্য কোনো গল্পে লাগাতে পারেন—যা খুশি।

১ম লেখক। তাহলে আমার গল্পের আর কী রইলো !

সম্পাদক। কেন, অর্ধেকের বেশিই তো রইলো। কমটা কী ?

১ম লেখক। কিন্তু মশাই, বইটার আপনি ওয়ান্-থার্ড কেটে দিলেন—

সম্পাদক। উহুঁ তার একটু বেশি। হিসেব মাফিক বললে—

১ম লেখক। গল্পের সমস্ত শেষটাই যে বাদ পড়ে গেল। শেষে কী হোলো কেউ বুঝতে পারবে না যে!

সম্পাদক। আরে মশাই, আপনি দেখছি নেহাৎ আনাড়ি। বাদ না দিলেও অংশটা বরবাদ্ই যেতো। মাসিকের পাঠকরা কি দু'হাজার শব্দের বেশি এগোয় কখনো? না, এগুতে পারে? তাই পড়তেই তারা জব্দ হয়ে পড়ে। লিখতে আর কী, লেখক বা কম্পোজিটারের কী আসে যায়, কিন্তু যাকে পড়তে হয় সে-ই তার ঠ্যালা বোঝে।

প্রুফ-রীডার। আর যাকে প্রুফ দেখতে হয়—

সম্পাদক। নতুন উপন্যাসের প্রথম কয়েক সংখ্যা অবশ্যি প্রায় লোকেই পড়ে—বিশেষ করে পাঠিকারা—হয়তো একটু আগ্রহ নিয়েই পড়ে—কিন্তু তার পরে আর পড়ে না। গোড়ার দিকের গল্পটা ততদিনে ভুলে মেরে দেয় কিনা—তাই আর ধারাবাহিকের ধার ঘেঁষতে চায় না। তবে হ্যাঁ, গোড়াটা পড়ে বটে। সেইজন্যেই গোড়াটা একটু জমাটি হওয়া দরকার।

প্রুফ-রীডার। তা নইলে আগাগোড়াই মাটি।

১ম লেখক। কিন্তু আমার গল্পের শেষটা—[তখনো তার আঁকুপাকুভাব।]

প্রুফ-রীডার। আপনার হাতেই তো আছে। পালায়নি।

সম্পাদক। আচ্ছা, কিভাবে আপনি শেষ করেছেন দেখাই যাক্ না—

[কাঁচি লাগানোর কাছাকাছি অন্তিম কথাগুলিতে তিনি চোখ বুলোন।]

আপনি শেষ করেছেন—মানে, ছেঁটে দেবার পরে যেখানে শেষ হয়েছে…এখানে আছে…'বলাই দাস হতাশ হয়ে বসে পড়লো।'… বাঃ! এইতো খাসা। হতাশ হয়ে বসে পড়লো—এর চেয়ে

ভালো পরিণতি আর কী হতে পারে? ওইখানে ও বসে থাক্‌লো আর আমরা ঐ অবস্থায় ওকে পরিত্যাগ করলাম—এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কী হতে পারে?

১ম লেখক। উউঃ—। [আর্তনাদ করে উঠল]।

সম্পাদক। [চম্‌কে উঠে] ওকি?…বইটার নাম আমরা দিয়েছি আর্তনাদের বিভীষিকা। তার ওপর আপনি আবার আরো বিভীষিকা সৃষ্টি করবেন না। দোহাই!

১ম লেখক। আ আঃ [দ্বিতীয় আর্তনাদ—অপেক্ষাকৃত অস্ফুটতর]।

সম্পাদক। আচ্ছা, আপনি তাহলে আসুন। বাড়ি গিয়ে উ-আ করুন গে। আমার কাজ আছে।

১ম লেখক। [কিঞ্চিৎ সামলে উঠে] লেখাটার মূল্যবাবদ—মানে, দক্ষিণাস্বরূপ কিছু কি আমি পেতে পারি? [জড়িতস্বরে সলজ্জভাবে জানায়]

প্রুফ-রীডার। [স্বগত] হ্যাঁ, এতক্ষণে আসল স্বরূপ দেখা দিয়েছে!

সম্পাদক। পাবেন বইকি, নিশ্চয়ই পাবেন। আমাদের বাঁধা দরেই আপনাকে দেওয়া হবে। যথাসময়েই পাঠিয়ে দেব।

১ম লেখক। যথাসময়ে—কবে? আমি একটু—আমার একটু—[বল্‌তে গিয়ে থেমে যায়]

সম্পাদক। অযথা দুঃসময়ের মধ্যে রয়েছেন—এই তো? তা, লেখকমাত্রেই থাকে। রিক্সা কিংবা লাঙল না টেনে কলম টান্‌লে তাই হয়। লেখা তো ধান-চাল নয় যে যথাসময়ে ফলবে—লেখারা হচ্ছে মেওয়া—সবুরে ফলে। তার ফল চাখতে আবার আরো দেরি। কিন্তু সে কথা যাক্। এখন শুনে রাখুন, লেখাটা বেরুবে বছর-খানেক ধরে, তার দু'বছর বাদে আমাদের চেক্ যাবে আপনার কাছে।

১ম লেখক। অতো দিন! ··কতো পাবো, আশা করতে পারি ?

সম্পাদক। উপযুক্ত দামই দেওয়া হবে। এটা লেখবার জন্য আপনার যে-পরিমাণ কাগজ, কালি, ব্লটিং ইত্যাদি খরচা হয়েছে সেইসব মোট করে, সেই সঙ্গে নিজের যে সময়টা আপনি এইভাবে নষ্ট করেছেন তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ হিসেবমতো আরো কিছু আপনাকে ধরে দেওয়া হবে।

প্রুফ-রীডার। লেখকের আবার সময়—তার আবার দাম! হ্যাঁ, প্রুফ-রীডার হলে কথা ছিল। তার অবশ্যি একটা দাম আছে—মাথার ঘাম ফেলে প্রুফ দেখতে হয়!

সম্পাদক। সময়ের দাম ধরতে হলে, অবশ্যি, এই লেখার সময়টা আপনি রিক্সা টেনে বা লাঙল ঠেলে কাজে লাগালে যা রোজগার করতে পারতেন ততটা অবশ্যি আমরা দিতে পারবো না, তবে আমাদের সাধ্যমত দেব, ঘাবড়াবেন না। আচ্ছা, তাহলে—নমস্কার!

[মাথা চুলকাতে চুলকাতে প্রথম লেখকের প্রস্থান]

২য় লেখক। একটা কথা বলবো ?

সম্পাদক। বলুন।

২য় লেখক। দেখুন, আমার টাকার কোনো চাহিদা নেই। আমার গল্পের দক্ষিণা যদি আপনি দশ বছর পরেও দেন তাহলেও আমার চলবে। এমনকি না-ও যদি দেন তাতেও আমার আপত্তি নেই। কাগজ-কালির দাম বাবদেও কিছু আমি চাই না। খালি যদি শুধু দয়া করে আমার লেখাটা—অমরবাবুর লেখার মত বাদ-সাদ দিয়েও—

সম্পাদক। না, আপনার লেখার সঙ্গে আমি কোনো বাদ সাধতে চাইনে। তাছাড়া, অমরবাবু হলেন পেশাদার লিখিয়ে,

তাঁর নাম আছে, অনেক কাগজে ছাপার হরফে তাঁর নাম বেরিয়েছে —আমি দেখেছি।

২য় লেখক। আমারও দেখবেন—ছেপেই দেখুন। না ছাপলে দেখবেন কি করে? অমর মিত্র না হতে পারি, কিন্তু অপূর্ব রায়ের নাম, আমি বাজি রেখে বলছি, বাংলাদেশে একদিন কারো অজানা থাকবে না। কেবল আপনি যদি আমার এই গল্পটা—আমার এই প্রথম চেষ্টা—

সম্পাদক। হ্যাঁ, প্রথম চেষ্টা! মনে পড়েছে—আপনার ঘড়িটা আবার সারতে হবে। ভুলেই গেছলাম। [সম্পাদক সেই ভোঁতা ছুরি আর সময়ে সময়ে একটা চোঁথা কলমের সাহায্য নিয়ে একটার পর একটা ঘড়ির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুলতে লাগলেন] —এই হোলো আপনার ঘড়ির ডায়াল্—এ দুটো হচ্ছে ঘণ্টার আর মিনিটের কাঁটা আর এইটা—এটা বোধহয়—যাকে বলে—ঘড়ির হৃৎপিণ্ড।

[জিনিসগুলি টেবিলের উপর জমা হোলো।]

আর এই সূক্ষ্ম তারের তৈরি—জিলিপির মত জিনিসটা—এর নাম হেয়ার-স্প্রিং। এটা কেটে গেলেই ঘড়ির বারোটা বেজে গেল। এটা কতোখানি লম্বা কে জানে!

[দু'হাতে ধরে সেটাকে লম্বা করার চেষ্টা করলেন, দেখতে দেখতে সেটা দু'খান হয়ে গেল। চমকে উঠলো লেখক।]

ঘাব্ড়াবেন না। সারিয়ে দেব। সব ঠিক হয়ে যাবে। এই টুকরোগুলো আপনার ঘড়ির মধ্যে—ঘড়ির দুই দেয়ালের মধ্যে পুরি আগে। ও বাবা, এ যে আঁট্ছে না। উঁচু হয়ে থাক্ছে যে! আশ্চর্য! একটু আগে এইসব কলকব্জাই কেমন মিলে-জুলে গায়ে

গায়ে লেপ্‌টে ছিল, আর এইটু ছাড়াছাড়ি হয়েছে কি অম্‌নি আড়াআড়ি! বাঙ্গালীর যা স্বভাব। [প্রুফ-রীডারকে সম্বোধন করে] ওহে, আঠার পাত্রটা দাওতো। আঠা দিয়ে জোড়া যায় কি না দেখি—

প্রুফ-রীডার। [গাম্‌পট্‌ এগিয়ে দিয়ে] আজ্ঞে, আঠা দিয়ে কি এ-জিনিস সাঁটা যাবে? মনে তো হয় না।

সম্পাদক। তুমি বলছো, 'এসব দৈত্য নহে তেমন?' আঠার সৌজন্যে আঁটো-সাঁটো হবার নয়? তাহলে হাতুড়িটাই দাও, দমননীতি অবলম্বন করেই দেখা যাক—দুরস্ত হয় কি না।

২য় লেখক। কী সর্বনাশ!

সম্পাদক। হাতুড়ি দিয়ে সারালে আরো ভালো হোতো। কিন্তু আপনি দেখছি রাজি নন্‌—যাক্‌, এও মন্দ হয়নি—এই নিন্‌ আপনার ঘড়ি।

২য় লেখক। এ কী হলো মশাই?

সম্পাদক। কেন, সেরে তো দিলাম।

২য় লেখক। এই বুঝি ঘড়ি সারানো? ঘড়ির যদি কিছু আপনি জানেন না, তবে হাত দিতে গেলেন কেন?

সম্পাদক। [সহাস্যমুখে] কেন, কী ক্ষতি হয়েছে? তাছাড়া -তাছাড়া, আমারও এই প্রথম চেষ্টা।

২য় লেখক। [স্তম্ভিতভাবে] ওঃ, আমার প্রথম লেখা বলেই এটা আপনার পছন্দ হয়নি? তাই বললেই পারতেন—ঘড়ি ভেঙে সেকথা জানানো কেন? [একটু নীরবতার পর] যাক্‌ গে, যেতে দিন। কাল না হয় আর একটা নতুন গল্প লিখে আন্‌ব, সেটা আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। লেখা আমার কাছে কিচ্ছু শক্ত না। চেষ্টা করলেই আমি লিখতে পারি।

সম্পাদক। [উৎসাহের সহিত] বেশ আন্‌বেন। ঐ সঙ্গে আর একটা নতুন ঘড়ি নিয়ে আসবেন মনে করে। আমাদের দু'জনেরই শিক্ষা হবে তাতে। আপনারও লেখায় হাত পাকবে, আমিও ঘড়ির বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করব।

২য় লেখক। আচ্ছা, আপনার কাগজে কবিতা দিলে হয় না? কবিতাও আমার আছে। ইচ্ছে করলে গদ্যের মত পদ্যও আমি আমি লিখতে পারি।

সম্পাদক। পদ্য?

২য় লেখক। পদ্য বা কবিতা যাই বলুন—তাও একটা আমি এনেছিলাম। খুব ছোট—দু-লাইনের। পড়বো? পড়তে পারি?

সম্পাদক। পারুন।

লেখক। অ্যাঁ?

সম্পাদক। কবিতা হচ্ছে ডিমের মতই জিনিস—কোন ভ্যাজাল নেই, তাই পারতে বলছিলাম।

লেখক। ও! কিন্তু ডিমের কবিতা নয়। আমার কবিতা হচ্ছে সিমের সম্পর্কে। আপনার কৃষি-বিষয়ক মাসিক কি না, তাই ভাবলাম—আচ্ছা, শুনুন।—সিম্।

সিমের মাঝে অসীম তুমি রাজাও আপন সুর।
ধামার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥

সম্পাদক। বাঃ, বেড়ে হয়েছে। আপনি বুঝি সিমের ভক্ত? সিম খান খুব? বড্ডো ভাল জিনিস, ভয়ঙ্কর ভিটামিন।

লেখক। সিম্ আমি খাইনে। বরং অখাদ্যই মনে করি। তবে কবিতাটা লিখতে হিম্‌সিম্ খেয়েছি বটে!

সম্পাদক। হ্যাঁ, এ চলবে। খাসা কবিতা লেখেন তো আপনি। স্বভাবকবি বলা যায় আপনাকে। হ্যাঁ, এরকম ছোটখাট কবিতার টুক্‌রো তরকারির টুক্‌রি থেকে তুলে এনে দিলে আমি ছাপতে

পারি। সানন্দেই ছাপাবো। ওঁর অমর উপন্যাসের পাশাপাশিই আপনার এইসব অপূর্ব কাব্য স্থান পাবে।

লেখক। বরবটির সম্বন্ধেও একটা আমার লেখা আছে—চট্‌পটির সঙ্গে মিলিয়ে। কেবল কুম্‌ড়োটা মেলেনি, মেলাতে গেলে দুমড়ে যায়—

সম্পাদক। বাজারেও মেলে না। বোধ হয় অকালকুষ্মাণ্ড বলেই!

লেখক। বয়েই গেল। কতো জিনিস আছে—গোলআলু! দয়ালুর সঙ্গে মিলবে। তাছাড়াও, ফুলকপি, মানকচু—অভাব কী! কবিতা লেখার আবার বিষয়ের অভাব!

সম্পাদক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কখনো সম্পাদক হবার মৎলব কি আপনার মাথায় এসেছে?

লেখক। না তো!

সম্পাদক। কেন, সম্পাদক হতে বাধা কী?

লেখক। আমার পক্ষে কি সম্ভব? এই সবেমাত্র লিখতে শুরু করেছি?

সম্পাদক। অসম্ভব কেন? লেখক না হতে পারলেও সম্পাদক হওয়া যায়।

লেখক। না বোধ হয়। বরং সম্পাদক হলেই তবে লেখক হওয়া সম্ভব। লেখা ছাপানোর কোনো দুঃখু থাকে না। কিন্তু আমার টাকা কই যে কাগজ বার করবো। আর অন্যের কাগজে কে আমায় সম্পাদক করবে!

সম্পাদক। আমিই করবো। দিনকতকের জন্যে হাওয়া বদলাতে আমি বাইরে যেতাম—সেই সময়টা আপনি যদি পারতেন—। অবশ্যি, না পারার কিছু নেই। আমার কৃষিতত্ত্বের কাগজ। বিশেষজ্ঞ একদল বাঁধা লেখক আছেন। তাঁদের নাম-

ঠিকানা দিয়ে যাব। ঘুরে ঘুরে লেখা যোগাড় করবেন। এই কাজ! আর এছাড়া সম্পাদকের আর কোনো কাজ নেই।

প্রুফ-রীডার। আছে বইকি! একদল লেখকের কাছে ঘোরা, আরেক দল লেখককে ঘোরানো?

সম্পাদক। ঠিক তাই, লেখা চেয়েচিন্তে এনে—এই এ ভদ্রলোক—আমাদের প্রুফ-রীডারের কাছে ফেলে দেবেন। ছাপানো, প্রুফ দেখা—ইত্যাদি আর যা করবার তা উনিই করবেন। সেই সব লেখার শেষে যে এক-আধটু ফাঁক থাকবে, সেখানে তাগ্‌মাফিক্ আপনার কবিতা—ওলকপি, গোলআলু, পালংশাক প্রভৃতির দু-চার ছত্তর ছাড়তে পারেন—বোঝার উপর শাকের আঁটির মতন,—বুঝেছেন?

লেখক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সম্পাদক। কেমন, পারবেন তো?

লেখক। ঠিক বলতে পারি না। আমার প্রথম চেষ্টা তো—কেমন দাঁড়াবে কে জানে!

সম্পাদক। তাহলে কাল সকালেই চলে আসুন। লেগে যান্ কাল থেকেই। আপনাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে কালই আমি গিরিডি যেতে চাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আগের সেই সম্পাদকীয় কামরা, দ্বিতীয় লেখক আর প্রুফ-রীডার উপস্থিত।

২য় লেখক। আপনাদের সম্পাদক তো লেখকের তালিকা দিয়েই সরপট্! এদিকে তাদের তাল সামলাতে আমার প্রাণ যায়!

প্রুফ-রীডার। কেন, কী হয়েছে ?

২য় লেখক। ঘুরতে ঘুরতে হয়রাণ হলুম। এক লেখকের কাছে একশো বার গেলেও একটা লেখা মেলে না—উঃ, এমন ল্যাজমোটা যে কী বলবো !

প্রুফ-রীডার। বটে ?

২য় লেখক। আগে ভাবতুম যে সম্পাদকরাই ভোগায়, এখন দেখছি ভোগা দিতে লেখকরাও কম নন্। সম্পাদক হওয়া বড়ো ঝক্মারি !

প্রুফ-রীডার। ঐ জন্যেই তো সম্পাদক হতে চাইনে। লেখক হবারও আমার সাহস হয় না। তাই প্রুফ-রীডার হয়ে আছি।

লেখক। ভালোই করেছেন। আরামের কাজ আপনার। ঘরে ঠাণ্ডায় পাখার তলায় বসে মজা করে প্রুফ দেখছেন। রোদে আর জলে—ঘেমে আর নেয়ে—এভাবে চল্‌লে—আমাকেও অচিরে আপনাদের সম্পাদকের মতই—

প্রুফ-রীডার। না না, ভগবান না করুন—

লেখক। আপনাদের সম্পাদকের মতই গিরিডি কি গোপালপুর হাওয়া বদলাতে ধাওয়া করতে হবে। ভদ্রলোকের কেন যে পা ফুলে বেরিবেরি হয়েছে—বুঝতে পারছি এখন। এই ঘোরাঘুরি করেই। আচ্ছা, বেরিবেরি হলে মানুষ বাঁচে ?

প্রুফ-রীডার। প্লেগ হলে তো বাঁচে না।

লেখক। প্লেগ আসে ইঁদুরের ছোঁয়াচে। আর বেরিবেরি বোধহয় লেখকের বাড়ি বাড়ি ঘুরলে—

প্রুফ-রীডার। ফাউন্টেন-পেনটা বুঝি নতুন কিনলেন ?

লেখক। হ্যাঁ—কিনলাম তাই। ঘুরতে পারবোনা বলেই কিনলাম। নাঃ, আর লেখার জন্য ঘোরাঘুরি নয়। এবার থেকে মাসিক কৃষিতত্ত্বের আষ্টেপৃষ্ঠে আমার নিজের লেখা দিয়েই ভরে দেব।

প্রুফ-রীডার। সে কি! উনি যে বলে গেছেন খালি লেখার তলায় দু-চার ছত্তর—

লেখক। তলা নয়, আগাপাশতলা। কাগজের জন্য আমি নিজে তলাতে পারি না। তলিয়ে যাবো কোথায়? উনি তো গিরিডি গেছেন—আমি পালাবো কোথা? পালামৌ না ভাগলপুর?

প্রুফ-রীডার। কবিতা দিয়ে ভরবেন? ও বাবা! তার জন্যে কতো গজ কবিতা লাগবে কে জানে।

লেখক। কবিতা কেন, সম্পাদকীয় দিয়ে। বড় বড় প্রবন্ধ দিয়ে একগজী দেড়গজী লেখা এক একটা—দিগ্‌গজ লিখিয়েরা যেমন লেখেন।

প্রুফ-রীডার। কী বিষয়ে লিখবেন?

লেখক। সমস্ত কৃষিমূলক। আবার কী? কৃষিতত্ত্বের কাগজ যে! তবে কৃষ্টিমূলক লেখা দিতেও বাধা নেই।

প্রুফ-রীডার। কিন্তু আপনার ঐ মূলক কি এই ছোট্ট মাসিক সইতে পারবে?

লেখক। সইয়ে দেব। তাই এই নতুন কলমটা কিনলাম। ভালো লেখা লিখতে হলে ভালো কলম লাগে। সম্পাদকীয় তো যা-তা কলমে লিখতে পারিনে, তাই এই পার্কার ফিফ্‌টিওয়ান—

প্রুফ-রীডার। ঘাড় কার ভাঙলেন?

লেখক। অ্যাঁ?

প্রুফ-রীডার। কোনো নতুন লেখকের বোধ করি?

লেখক। ও, কার ঘাড় ভাঙলাম? নিজের। আবার কার? এই কলমে খানিকটা সম্পাদকীয় লিখে এনেছি, শুনবেন—?

প্রুফ-রীডার। বুঝতে পারবো?

লেখক। না পারার কী আছে—শাদা বাংলায় লেখা। শুনুন: আমাদের দেশে ভদ্রলোকদের মধ্যে কৃষিকর্মের বিষয়ে দারুণ অজ্ঞতা

দেখা যায়। এমন কি, অনেকের এরকম ধারণা আছে যে, এই যে সব তক্তা আমরা দেখি তক্তপোষে আর দরজায়, কড়ি আর বর্গায় যে সব কাঠ শোভা পায়—জান্‌লার খড়খড়ি, চেয়ার আর পেন্সিলে যে সব কাঠ সাধারণতঃ দেখা যায় সেই সমস্তই ধান গাছের। কিন্তু মোটেই তা নয়—'

প্রুফ-রীডার। ঠিক বলেছেন। আমিও অনেকদিন একথা ভেবেছি! যে এই বিষয়ে—এই ধানগাছকে সর্বশক্তিমান বলে ধারণা করা—একেবারে ভগবানের ঠিক পরেই—এটা আমাদের একটু বাড়াবাড়ি

লেখক। যা বলেছেন। সেই জন্যেই আমার এই সাবধান করা। তারপর শুনুন: 'এটা সত্যই শোচনীয়। তারা শুনলে আশ্চর্য হবেন যে ওগুলো ধানগাছের তো নয়ই, বরঞ্চ পাটগাছের বলা গেলেও যেতে পারে।'

প্রুফ-রীডার। পাট!

লেখক। হ্যাঁ। 'অবশ্য পাটগাছ ছাড়াও কাঠ জন্মায়, আম জাম কাঁঠাল নারকেল ইত্যাদি বৃক্ষেরাও আমাদের তক্তাদান করে থাকে। এটা ওদের বহুকালের বদভ্যাস। কিন্তু নৌকার পাটাতনে যে কাঠ ব্যবহৃত হয় তা কেবল্মাত্র পাটের—'

প্রুফ-রীডার। থামুন থামুন! কী বললেন?

লেখক। '—নৌকোর পাটাতন নিছক পাটের। এই কারণে কাঠকে যদি আমরা গৃহস্থালীর রাজা বলি, পাটকে তা হলে রাণী, পাটরাণীই বলতে হয়।'

প্রুফ-রীডার। বাঃ, বেড়ে হয়েছে! একেবারে পাট করে ছেড়েছেন!

লেখক। এ মাসের কৃষিতত্ত্ব আর দেখতে হবে না। বাজারে পড়তে না পড়তেই লোপাট! দেখে নেবেন।

তৃতীয় দৃশ্য

তিনমাস পরে। দৃশ্য পূর্ববৎ।

সম্পাদকের ঘরে দু'জন লোক, পাড়াগেঁয়ে মানুষ, চাষার মত বেশভূষা, টেবিল-চেয়ার দখল করে বসে আছে। লেখককে প্রবেশ করতে দেখেই তারা তটস্থ হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য তাদের যেন ব্রীড়াবনত দেখা গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আর দেখা গেল না। লেখকের পাশ কাটিয়ে সবেগে তারা প্রস্থান করেছে। প্রুফ-রীডার ঠিক সেই সময়েই ভেতরের দিক থেকে এল।

লেখক। এ কী! কারা,এরা?

প্রুফ-রীডার। ঐ দু'জন? ওরা পাড়াগাঁ থেকে এসেছিল। এই একটু আগেই।

লেখক। কেন? কোন লেখক-টেখক নাকি?

প্রুফ-রীডার। আজ্ঞে না। কলম নয়, লাঙল ঠেলাই ওদের পেশা।

লেখক। এসেছিল কেন?

প্রুফ-রীডার। আপনার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করতে ঠিক নয়। আপনাকে দেখতেই।

লেখক। [গর্ববোধে] বটে?

প্রুফ-রীডার। আমি ওদের বস্‌তে বলে ভেতরে গেছলাম! প্রেসে আপনার কপি দিতেই।...আপনার আজ এত দেরি যে?

লেখক। ভিড় ঠেলে কি ঢুকতে পারি? সারা গলিটাতেই লোক কিলবিল করছে। গলির মোড় থেকে আপিসের গোড়া পর্যন্ত সমান।

প্রুফ-রীডার। আপনাকে দেখতেই।

লেখক। দেখুন, কী বলেছিলাম! চার মাসের মধ্যে

আপনাদের কাগজ দাঁড় করিয়ে দেব। সম্পাদক গিয়েছেন তিন মাসও হয়নি—এর মধ্যেই, কাগজ দাঁড়ানো কী—দৌড়চ্ছে।

প্রুফ-রীডার। দৌড়নো কী—উড়ছে! উড়ে যাচ্ছে। বাজারে পড়তেই পায় না কাগজ, পড়তে না পড়তেই হাওয়া। হকাররা তো মারামারি লাগিয়েছে আমাদের কাগজের জন্যে।

লেখক। এত ছাপিয়েও কূল পাচ্ছেন না, কুলিয়ে উঠতে পারছেন না?

প্রুফ-রীডার। সত্যি! আপনি যা পপুলার হয়েছেন!

লেখক। আমি? না—আমাদের এই কাগজ?

প্রুফ-রীডার। একই কথা। সম্পাদক মশাই ফিরে এসে নিশ্চয় খুব খুশি হবেন।

লেখক। হতেই হবে। ছিল কী! কৃষিতত্ত্ব নামে একটা মাসিক—নামেই মাসিক, বেরুতো তিন মাসে একবার—ছাপা হোতো পাঁচশো কপি! আর আজ? দেখতে না দেখতে চাহিদা বাড়লো—কাট্‌তি বেড়ে গেল হু-হু করে। মাসিক থেকে পাক্ষিক—পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক এখন! এখনো এর জনপ্রিয়তা বাড়তির দিকে। ভাবছি অর্ধ-সাপ্তাহিক করে দেব আস্‌ছে হপ্তা থেকে। শেষ পর্যন্ত দৈনিক করতে হয় কিনা কে জানে!

প্রুফ-রীডার। আশ্চর্য নয়।

লেখক। তারপর কাটতির কথাটা ভাবুন। পাঁচশো থেকে এগারোশো—তারপরে ২২০০, ৩৩০০, ৪৪০০, ৭৫০০—বেড়ে বেড়ে—এখন এর গ্রাহক কতো হয়েছে মশাই?

প্রুফ-রীডার। তা, হাজার পনের হবে।

লেখক। বিশ হাজার করে দেব—দেখুন না!—এই নিন্ আমার নতুন লেখা—

প্রুফ-রীডার। আপনি তো দুটো প্রবন্ধ দিয়েছেন।

লেখক। সে তো প্রবন্ধ। এটা হোলো এ হপ্তার সম্পাদকীয়।

প্রুফ-রীডার। তাহলে কপিটা দিয়ে আসিগে প্রেসে।

[প্রুফ-রীডার ভেতরের দিকে গেল। জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, লম্বা দাড়ি সমেত, প্রবেশ করলেন। হাতে ছড়ি।]

প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আপনি কি নতুন সম্পাদক ?

লেখক। আমিই।—কী বলুন ?

প্রৌ-ভ। আপনিই কি এর আগে কোনো কৃষি-পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন ?

লেখক। আজ্ঞে না। এই আমার প্রথম চেষ্টা।

প্রৌ-ভ। তাই মনে হয় বটে। হাতে-কলমে কৃষিকাজের কোনো অভিজ্ঞতাও নেই বোধহয় আপনার ?

লেখক। একদম না।

প্রৌ-ভ। আমারও তাই মনে হয়েছে। [এই বলে পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা কাগজ বার করলেন] এই আপনার গত সপ্তাহের কৃষিতত্ত্ব ! এই সম্পাদকীয় আপনার লেখা—তাই নয় কি ?

লেখক। [ঘাড় নেড়ে] এটাও আপনি ঠিক ধরেছেন।

প্রৌ-ভ। আমার আন্দাজ ঠিকই দেখছি। আপনি লিখেছেন ঃ 'মূলো জিনিসটা পাড়বার সময়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কখনই টেনে ছেঁড়া উচিত নয়, তাতে মূলোর ক্ষতি হয়। তার চেয়ে বরং একটা ছেলেকে গাছের ওপরে তুলে দিয়ে ডালপালা নাড়তে দিলে ভালো হয়। খুব কষে নাড়া দরকার। ঝাঁকি পেলেই টপাটপ মূলোবৃষ্টি হবে, তখন কুড়িয়ে নিয়ে ঝাঁকা ভরো—' এর মানে কী ?

লেখক। কেন, মানে তো খুব স্পষ্ট। বুঝতে পারছেন না ?

প্রৌ-ভ। মানে বেশ বুঝছি। কিন্তু আমার কথা এই যে, এর সমস্তটাই সম্পূর্ণ অমূলক।

লেখক। অমূলক? মূলোর আপনি কিছুই জানেন না, তাই অমন কথা বলতে পারলেন! আপনি কি জানেন, বছর বছর, কতো হাজার হাজার লাখ লাখ মূলোর এইভাবে ক্ষতি করা হয়—টেনে ছিঁড়ে তাদের মূলোৎপাটন করা হয়? আপনি বলবেন, মূলো গেলে কী! তাতে আর কার যায় আসে? কিন্তু মোটেই তা নয় মশাই—মূলোর সর্বনাশে আমাদেরই সর্বনাশ, আমাদেরই ভিটামিন-হানি! এইভাবে মূলোর অপচয় না করে যদি মূলোকে গাছেই পাকতে দেয়া হতো, এবং তার পরে হাল্‌কা ওজনের একটা ছেলেকে গাছের ওপরে—

প্রৌ-ভ। গাছের ওপরে?

লেখক। হ্যাঁ, ঐ মূলোগাছের ওপরেই। তাহলে মূলোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেরও উন্নতি হোতো। আমাদের জাতির জীবনধারাই বদলে যেত। আমূল বদলাতো। দিনের পর দিন ভিটামিনসঙ্কুল মূলো খেয়ে আমরা হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হতে পারতাম।

প্রৌ-ভ। নিকুচি করেছে গাছের। মূলো—গাছেই জন্মায় না।

লেখক। কী! গাছে জন্মায় না? অসম্ভব—এ কখনো হতে পারে? মানুষ ছাড়া সব কিছুই গাছে জন্মায়, এমন কি বাঁদর পর্যন্ত।

প্রৌ-ভ। তোমার মুণ্ডু!

[মুখ বিকৃত করে তিনি কৃষিতত্ত্বখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি করলেন—করে ঘরময় উড়িয়ে দিলেন—তারপরে হাত দিলেন নিজের ছড়িতে। লেখককে একটু শঙ্কিতই দেখা গেল। কিন্তু না, লেখক ছাড়া ঘরের সব কিছু, টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, আলমারি ইত্যাদি সবাইকে ছড়িপেটা করে অনেক ভেঙেচুরে, অনেকটা শান্ত হয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। প্রুফ-রীডারের প্রবেশ।]

প্রুফ-রীডার। এ কী! এ কী কাণ্ড?

লেখক। একজন মাস্টার এসেছিল।

প্রুফ-রীডার। মাস্টার!

লেখক। মাস্টারই তো! ঘরের সব কিছু আগাপাশতলা বেতিয়ে চলে গেছেন। দেখছেন না, টুল দুটো নীলডাউন হয়ে আছে!

প্রুফ-রীডার। আবার আসবে নাকি?

লেখক। কে জানে, আসতেও পারে—হয়তো!

প্রুফ-রীডার। মাস্টারদের আমার ভারী ভয়। ছেলেবেলা থেকেই। আমি তাহলে প্রেস্-ঘরে যাই। সেইখানে বসেই প্রুফ দেখিগে— [প্রস্থান

[লেখক কাগজ-কলম নিয়ে জাঁকিয়ে বসে লেখার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে একজন লোক দরজার কাছ থেকে উঁকি মারল। বদ্‌খৎ একটা লোক—হাতে লাঠি। ঘরে ঢুকেই হঠাৎ যেন সে কাঠের পুতুল হয়ে গেল। আঙুল কামড়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, কুঁজো হয়ে, কান খাড়া করে কী যেন শোনবার চেষ্টা করলো। কোথাও কোনো শব্দ ছিল না। তথাপি সে শুনতে লাগলো। তারপরে পা টিপে টিপে কাছাকাছি এগিয়ে গভীর ঔৎসুক্যে দেখতে থাকলো লেখককে—কিছুক্ষণ একেবারে নিষ্পলক। তারপরে কোটের বোতাম খুলে ভেতরের পকেট থেকে একখণ্ড কৃষিতত্ত্ব বার করল সে।]

বদ্‌খৎ লোকটা। এই যে, তুমিই লিখেছ! পড়—পড় এইখানটা, তাড়াতাড়ি। আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে।

লেখক। [পড়তে থাকে] 'মূলোর বেলা যেমন, আলুর বেলা সে রকম করা চলবে না। গাছে ঝাঁকি দিয়ে পাড়লে আলু চোট খায়, এই কারণেই আলু পচে আর তাতে পোকা ধরে। আলুকে গাছে বাড়তে দিতে হবে—এন্তার—যদ্দুর তার খুশি। এ রকম

করলে এক-একটা আলুকে তরমুজের মত বাড়তে দেখা যাবে। তখন ওদের ফজলি আমের মতন আলাদা-আলাদা ঠুশিপারা করতে হবে। সেইটাই নিয়ম। কিন্তু হায়, আমরা আলু খেতেই শিখেছি—আলুর যত্ন নিতে শিখিনি। আলুর প্রতি যদি আমরা দয়ালু হই, যদি একমনে ওদের সেবা করি, তাহলে আলুকেও আমরা একমণের দেখতে পাবো। এককেটা আলুর পক্ষে ওজনে একমণ হয়ে ওঠা এমন কিছু—'

বদ্খৎ। হ্যাঁ হ্যাঁ। [কাগজখানা কেড়ে নিয়ে] আর এই যে, 'পেঁয়াজ আমরা আঁকৃশি দিয়ে পাড়তে পারি, তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই। অনেকের ধারণা পেঁয়াজ গাছের ফল, কিন্তু মোটেই তা নয়। বরং ওকে ফুল বলে ধরাই উচিত। ফুল হলেও ওর কোন গন্ধ নেই —যা আছে তা দুর্গন্ধ। ওর খোসা ছাড়ানো মানেই কোরক ছাড়ানো। পেঁয়াজেরই অপর নাম শতদল।'—বাঃ বাঃ, খাসা লেখা! এবার তুমি পড়ো—

লেখক। 'পেঁয়াজের সঙ্গে পয়জারের কোনই সম্পর্ক নেই— অনেক সময়ে ওদের আমরা একসঙ্গে উচ্চারণ করি বটে, কিন্তু ওরা ভিন্ন গাছের ফল। আদা আর কাঁচকলার মতই আলাদা।—অতি প্রাচীনকালেও এদেশে ফুলকপি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাকে আহার্যের মধ্যে তখন ধরা হতো না। শাস্ত্রে বলেছে, 'অলাবু ভক্ষণ নিষেধ'—সেটা ফুলকপির সম্বন্ধেই। আর্যেরা কপি খেতেন না। অনার্য জাতিদের ওটা অখাদ্য ছিল। 'গজভুক্ত কপিত্থ' এই প্রবাদবাক্যেই তার পরিচয় মেলে।—বাতাবিনেবুর গাছে কমলানেবু ফলানোর সহজ উপায় হচ্ছে—'

বদ্খৎ। ব্যস্ ব্যস্—ওতেই হবে। আমি জানি আমার মাথা ঠিকই আছে, কেননা তুমি যা পড়লে আমিও ঠিক তাই পড়েছি— ঠিক ওই কথাগুলোই। আজ সকাল পর্যন্ত এই ধারণা আমার

অটল ছিল—তোমার কাগজটা পড়ার আগে পর্যন্ত। যদিও আমার আত্মীয়রা সর্বদা আমাকে নজরে নজরে রাখে, তবু আমি জানতাম যে মাথা আমার ঠিকই আছে—

লেখক। নিশ্চয়! বরং অনেকের চেয়ে বেশী ঠিক— এ কথাই আমি বলব। এইমাত্র একজন বুড়ো লোক—ইস্কুলমাস্টার কিনা কে জানে—কিন্তু যাক্ সে কথা।

সেই লোক। [জোর দিয়ে] হ্যাঁ, যাক্। তবে আজ সকালে তোমার কাগজ পড়ে সে ধারণা আমার টলেছে। এখন আমি বিশ্বাস করি যে সত্যি সত্যিই আমার মাথা খারাপ! এই বিশ্বাস হওয়ার সাথে সাথে আমি এক দারুণ চিৎকার ছেড়েছি—নিশ্চয়ই তুমি এখানে বসে তা শুন্‌তে পেয়েছো।

লেখক। না তো!

সেই লোক। আল্‌বাৎ পেয়েছো। দু মাইল দূর থেকেও তা শোনা যায়। আমি এখানে এসেও সেই আওয়াজ শুন্‌লাম যে, এই ঘরে ঢুকেই— নিজের কানে। তারপর সেই ডাক ছেড়েই এই লাঠি নিয়ে আমি বেরিয়েছি, কাউকে খুন না করা অব্‌দি আমার স্বস্তি হচ্ছে না। বুঝতেই তো পারছো, আমার মাথার যা অবস্থা তাতে একদিন না একদিন কাউকে না কাউকে খুন আমায় করতেই হবে। তবে সেটা আজই কেন হয়ে যাক্ না?

লেখক। অ্যাঁ—?

সেই লোক। বেরুবার আগে আরেকবার তোমার প্যারাগুলো পড়লাম, সত্যিই আমি পাগল কিনা নিশ্চিত হবার জন্য। তার— তার পরেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি। রাস্তায় যাকে পেয়েছি তাকেই ঠেঙিয়েছি। অনেকে খোঁড়া হয়েছে, অনেকের মাথা ফেটেছে। সবশুদ্ধ কতজন হতাহত হয়েছে বলতে পারি না, তবে একজনকে জানি, সে গাছের উপর উঠে বসে আছে।

গোলদীঘির ধারে—বোধহয় তোমার এক পেঁয়াজ গাছে। থাক্না, যখন খুশি তাকে আমি পেড়ে আন্তে পারবো। মূলোর মত সমূলেই! তারপর মনে হলো তোমার সঙ্গে একবার মূলাকাৎ করে যাই—মূলোর কথা তো তুমিই লিখেছো—

লেখক। [অতিশয় ভীত] আর লিখবো না!

সেই লোক। কিন্তু তোমায় আমি সত্যি বলছি, যে লোকটা গাছে চেপে রয়েছে তার কপাল ভালো। এতক্ষণ বেঁচে আছে তবু। ওকে খুন করে আসাই আমার উচিত ছিল। যাক্, ফেরার পথে ওর সঙ্গে আবার বোঝাপড়া হবে! এখন আসি তাহলে—নমস্কার।

[প্রস্থান

লেখক। আঃ! [হাঁপ ছেড়ে] একটু যে নিশ্চিন্ত মনে লিখবো তারো যো নেই। সম্পাদকী কি ঝক্মারিরই কাজ!

[পুরাতন সম্পাদকের প্রবেশ। তাঁর মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ণ]

আসুন, আসুন। আস্ত্যাজ্ঞা হোক—নমস্কার।

সম্পাদক। তুমি আমার কাগজের সর্বনাশ করেছো।

লেখক। কেন, কাট্তি তো বেড়েছে অনেক।

সম্পাদক। হ্যাঁ, কাগজ বহুত কাট্ছে, আমি জানি। কিন্তু আমার মাথাও কাটা গেছে সেই সাথে!

লেখক। মাথা কাটা গেছে! কী বল্ছেন?

সম্পাদক। দুঃখের বিষয়, খুবই দুঃখের বিষয়! কৃষিতত্ত্বের সুনামের যে হানি হোলো, যে বদনাম রটলো, তা বোধহয় আর কোনওদিন ঘুচবে না।

লেখক। বদ্নাম রটলো? কাগজের চাহিদা ভাবলে—

সম্পাদক। কাগজের এত বেশী বিক্রি এর আগে কখনো হয়নি বা এমন নামডাকও ছড়িয়ে পড়েনি চারদিকে তা ঠিক। কিন্তু পাগলামির জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে কী লাভ? কেউ কি সে খ্যাতি চায়?

একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ছ্যাখো, চারধারে কী রকমের ভিড়, কী সোরগোল! তারা সবাই দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে দেখবার জন্য। তাদের ধারণা তুমি বদ্ধ পাগল।

লেখক। আপনার ধারণা ভুল। ওরা আমার প্রতিভাকে সম্মান দেখাতেই এসেছে।

সম্পাদক। ওদের দোষ কী? যে তোমার সম্পাদকীয় পড়বে তারই ওই ধারণা বদ্ধমূল হবে। তুমি যে চাষবাসের বিন্দুবিসর্গও জানো তা তো মনে হয় না। কপি আর কপিত্থ যে এক জিনিস একথা কে তোমাকে বললো? গোল আলুর সম্বন্ধে তুমি যে গবেষণা করেছো, মূলো চাষের যে আমূল পরিবর্তন আন্‌তে চেয়েছো সে সম্বন্ধে তোমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই।

লেখক। অভিজ্ঞতা নেই! একথা আপনার পক্ষেই বলা সাজে!

সম্পাদক। তুমি লিখেছো শামুক অতি উৎকৃষ্ট সার, কিন্তু তাদের ধরা ভারী শক্ত। মোটেই তা নয়, শামুক আদৌ সারবান না, আর তাদের দ্রুতগতির কথা এই প্রথম আমি শুনলাম। তাছাড়া, তারা তামুকের চাষে কোনোকালে লাগে না। তারপর তুমি লিখেছো, কচ্ছপদের দ্বারা জমি চষানো যায়—নেহাৎ চাষা না হলে এমন কথা কেউ লেখে না।

লেখক। যায় না? আপনিই বলুন?

সম্পাদক। অসম্ভব—সম্পূর্ণ ই অসম্ভব। হাজার উৎসাহ দিলেও জমি তারা চষবে না—তারা তো বলদ্ নয়। তোমার মত বলদ্ নয় তো! তুমি যে লিখেছো, ঘোড়ামুগ ঘোড়ার খাদ্য আর কলার বীচি থেকে কলাই হয়ে থাকে, তার বালাই নিয়ে মরতে হয়! তার ধাক্কায় আমার কাগজ উঠে না গেলে বাঁচি—

লেখক। উঠে যাবে! বলে, বাজারে পড়তে পাচ্ছে না!

সম্পাদক। গাছের ডাল আর ছোলার ডালের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, দেড় পাতা খরচ করে তা বোঝাবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। কেবল তুমি ছাড়া আর সবাই একথা জানে! যাক্, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি বিদায় নাও। তোমাকে আর সম্পাদকতা করতে হবে না। আমার আর বায়ুপরিবর্তনে কাজ নেই। গিরিডিতে গিয়ে এই ক'মাস আমার স্বস্তি ছিল না—বেরিবেরি সারা দূরে থাক্ —তোমার পাঠানো কাগজ পাবার পর থেকে উপ্‌রি আমার হৃদ্‌রোগ দাঁড়িয়ে গেছে। পরের সপ্তাহে ফের তুমি কী গবেষণা করে বসবে তাই ভেবে সর্বদাই আমার বুক কেঁপেছে—

লেখক। আমার লেখার জন্য নয়, বেরিবেরির শেষ অবস্থায় ওরকম হয়। আর তারপরেই হার্টফেল্ হয়।

সম্পাদক। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! যখনই তোমার ঘোষণার কথা ভেবেছি—জাম, জামরুল আর গোলাপজাম কি করে একই গাছে ফলানো যায়, পরের সংখ্যাতেই তুমি তার উপায় বাৎলাবে—ভালো কথা নিজামকে তুমি বাদ দিলে কেন? তাঁকেও কি ঐসঙ্গে ফলাও করা যেত না?

লেখক। [চটে গিয়ে] আপনি একটি আস্ত বাঁধাকপি? কেন বাদ দিলাম তা আপনার মগজে তো ঢুকবে না। নিজামকে নিলে মিহিজামকেও তো নিতে হোতো? আর জামতাড়াই বা তখন কী দোষ করলো?

সম্পাদক। নিলেই পারতে—কোনোই দোষ করেনি। জামরুলের মতো নিজামেরও তো rule ছিল। যাক্, যখনই আমি জেনেছি যে পরের সংখ্যাতেই তুমি এই ত্রিফলা ফলাবে তখন থেকেই নাওয়া-খাওয়া আমার মাথায় উঠেছে—বেরিবেরিতে প্রাণ যায় সেও ভালো—তখনই কলকাতার টিকিট কিনে গাড়িতে চেপেছি।

লেখক। আশ্চর্য, দুনিয়াটা এই রকমই বটে! আপনারই কাগজের কাট্‌তি আর খ্যাতি বাড়িয়ে দিলাম, আয়ও বেড়ে গেল কত, অথচ আপনিই আমাকে গালমন্দ করছেন! মানুষ এইরকমই নেমকহারাম্। যাক্ গে, যাবার আগে তবে আমার কথাটাও বলি —আমার বক্তব্যটাও শুনুন তা হলে।

সম্পাদক। তোমার কোনো কথা আমি শুনব না।

লেখক। আপনি কাণ্ডজ্ঞানহীন, আপনার ভদ্রতাবোধও নেই। আপনি একটি আসল বরবটি। আপনার কাছ থেকে এরূপ ব্যবহার লাভ করবো তা আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি। কিন্তু আপনার মতো শালগম আর গাজরের কাছে এর বেশি আর কী আশা করা যায়? যদি ভূমিকুষ্মাণ্ড না হতেন, তাহলে অবশ্যই বুঝতেন কৃষিতত্ত্বের কী উন্নতি আর আপনার কতখানি উপকার আমি করেছি। কী আর বলব আপনাকে, পালংশাক, পানফল, মানকচু, যা খুশি বলা যায়। আপনার মাথায় কোনো তালশাঁস নেই। আপনি একটি কামরাঙা। আপনাকে পাতিনেবু বললে পাতিনেবুর অপমান করা হয়—

সম্পাদক। আমি! আমি পাতিনেবু! একজন সামান্য লেখকের মুখে—

লেখক। আপনাকে আমি আর ভয় করি না। সত্যি কথা স্পষ্ট করে বল্‌তে আমার আর কোনো দ্বিধা নেই। সত্যি বল্‌তে, সম্পাদক হবার জন্য আমি জন্মাইনি। যারা সৃষ্টি করে আমি তাদেরই একজন, আমি হচ্ছি লেখক। এবং সামান্য লেখক এই। আপনার মত লোক—নিতান্তই যারা টম্যাটো—যারা কবিতা লিখতে পারে না, শিশুপাঠ্য বই লিখতেও অপারগ, থিয়েটারের নাটক যাদের কলমে আসে না, এমন কি, সিনেমার গল্প লিখতেও অপটু—তারাই হাত-চুলকানি থেকে বাঁচবার জন্যে আপনার মত কাগজের সম্পাদক হয়।

সম্পাদক। কে হতে বল্‌ছে সম্পাদক? যাও না, লেখক হওগে না। বাধা দিচ্ছে কে? পুনর্মূষিকো ভব!

লেখক। হবই তো। আমিই লেখক—বিধাতার সগোত্র আমি। ভূঁইফোড় কাগজের সম্পাদক হওয়া আমার কম্মো না। এই দণ্ডেই সম্পাদকগিরিতে আমি ইস্তফা দিচ্ছি। আর এক মুহূর্তও এখানে থাক্‌তে আমার রুচি নেই! চাষাড়ে কাগজের সম্পাদকের কাছে ভদ্রতা আশা করাই বাতুলতা। ঘড়ির দশা দেখেই আমার শিক্ষা হওয়া উচিত ছিলো।

সম্পাদক। আমারও উচিত ছিলো শিক্ষা হওয়া। তুমি যে ছুঁচ হয়ে ঢুকে এখানে এসে ফাল চালাবে—আমি ভাবতে পারিনি। সিমের মাঝে অসীম তুমি—সে যে তুমিই, তা কী তখন ভেবেছিলাম।

লেখক। যাচ্ছি আমি, কিন্তু একথাও জেনে রাখুন, আমার কর্তব্য আমি করে গেছি। ইচ্ছা ছিল, আপনার কাগজ সর্বশ্রেণীর পাঠ্য করে তুলবো—তা আমি করেছিও। বলেছিলাম আপনার কাগজের কুড়ি হাজার গ্রাহক করে দেব—যদি আর দু-সপ্তাহ পেতাম, তাও আমি করতে পারতাম। এখন—এখনই আপনার পাঠক কারা? কোনো কৃষির কাগজ, এমন কি, কৃষ্টিমূলক কাগজের ভাগ্যেও যা কোনদিন জোটেনি, সেই সব লোক আপনার কাগজের পাঠক—যত উকীল, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, মোক্তার, হাইকোর্টের জজ, কলেজের প্রফেসর, প্রধান-অপ্রধান মন্ত্রীরা—সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। একজনও চাষা নেই ওর মধ্যে—যতো চাষা গ্রাহক ছিল তারা সব চিঠি লিখে কাগজ ছেড়ে দিয়েছে—সেই সব চিঠি টেবিলের ওপর ঐ গাদা হয়ে আছে—ঐ। পড়ে দেখুন। কিন্তু আপনি—

সম্পাদক। আমার গ্রাহকরা কাগজ ছেড়ে দিয়েছে? হায় হায়!

লেখক। হায় হায় করছেন—তা করবেন বইকি! আপনি এমনি চালকুমড়ো যে পাঁচশো মুখ্যু চাষার জন্যে পনের হাজার উচ্চশিক্ষিত গ্রাহক পরিত্যাগ করলেন। আপনার খুশি! আপনার কাগজকে মাসিক থেকে পাক্ষিক, পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিকে দাঁড় করিয়েছিলাম, ক্রমেই একে অর্ধ-সাপ্তাহিক, এমন কি, দৈনিক পর্যন্ত করতে পারতাম, কিন্তু তার দরকার নেই। পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাক্ —আমার কী! আমিও আপনাকে বলি—পুনর্মাসিকো ভব—আবার ফিরে মাসিক হোন্‌গে ফের। আমি চললাম!

[তীরবেগে প্রস্থান

যবনিকা

দেবা ন জানন্তি!

নেহাৎ ছোটদের জন্য নয়

দেবা ন জানন্তি !

ড্রইং রুম। লাবণ্য বুনছিল, এমন সময়ে ললিতা এসে একটা সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিল।

ললিতা। দেবেঁনবাবু কোথায় দিদি ?

লাবণ্য। গেছেন যশিডিতে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই মজে গেছেন মনে হয়। রাত্রে ফিরবেন কিনা কে জানে! না যদি ফেরেন তো কাল সকালে আমাদের ত্রিকূট বেড়ানোর প্রোগ্রামটাই মাটি।

[ললিতা চুপ করে থাকে।]

লাবণ্য। তুই তো বেশ ফুর্তিতেই বিকেলটা কাটিয়েছিস মনে হচ্ছে। কোথায় গেছ্‌লি বেড়াতে ? দেহাতে ? গণেশবাবু কই ? তাঁকে দেখছিনে ?

[ললিতা অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে।]

লাবণ্য। অ্যাঁ ? কোনো অ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটেছে নাকি তাঁর ?

ললিতা। তাঁর ? না। তাঁর আবার কি অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে ?

লাবণ্য। তাহলে তোরই যেন কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে।

ললিতা। যা হয়েছে তাকে অ্যাক্‌সিডেণ্ট বলা যায় কি না জানিনে। তবে তোমাকে জানানো দরকার। মেজদি, গণেশবাবু বিয়ের কথা পেড়েছিলেন আজ। এই একটু আগেই।

লাবণ্য। তাই ভালো! আমি ভাবছিলাম না জানি কী তা—তা—তুই কি রাজী হয়েছিস্‌ ?

ললিতা। আমি ? না।

লাবণ্য। তবু ভালো।

ললিতা। কী যে করি কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে মেজদি। তুমি আমাকে পরামর্শ দাও।

লাবণ্য। দেব বইকি লতু। কিন্তু আমার পরামর্শ কোনো কাজের হবে কি না বুঝতে পাচ্ছিনে। ভাবতে শুরু করলে এমন সব উল্টো-পাল্টা ভাবনা এসে জোটে, এত সব আজগুবি কথা মাথায় আসে যে, তার কিছু যদি আমি ঠাওর করতে পারি।

ললিতা। এমন গুরুগম্ভীর ভাবে শুরু হোলো, বলব কি মেজদি, প্রথমে তো আমি ঘাবড়েই গেছলাম। গণেশবাবুর মুখ থেকে এ হেন প্রস্তাব আমি ভাবতেই পারি নি। কিন্তু আমি হুঁসিয়ার ছিলুম, দিদি, 'হ্যাঁ', বলিনি—কিছুতেই না। জানি, হ্যাঁ বলা তো খুবই সোজা, বলে দিলেই হোলো। আর বললেই গেল চুকে। কী বলো মেজদি, ঠিক করিনি ?

লাবণ্য। কী জানি ভাই !

ললিতা। আমি বলেছি—'জানি না' ! জানিই না তো। তা ছাড়া, আমায় তো ভেবে দেখতে হবে। বিয়ে হেন ব্যাপার—ঝপ. করে ক'রে বসলেই তো হোলো না ! রীতিমত ভাবনার বিষয়। নয় কি মেজদি ? কিন্তু গণেশবাবুর যেন কেমন ধারা ! কি রকম অন্যায় আবদার ! বলেন, ভাববার আবার কী আছে ? ভাবনার নাকি যথেষ্ট সময় আমি পেয়েছি। ওঁর ভাবখানা যেন, 'বিয়ে' এ আর এমন কী ! কী এমন সাংঘাতিক ! একটা তুচ্ছ ব্যাপার যেন। করে ফেললেই হোলো।

লাবণ্য। তাই যদি ভাব হয়ে থাকে তো তেমন দোষ ওঁকে দেওয়া যায় না। তুমি ওঁকে এতদিন উৎসাহ দিয়ে এসেছো, একথাও তো মিথ্যে নয়। এ-অভিযোগও উনি করতে পারতেন অনায়াসে।

ললিতা। [অবাক হয়ে] উৎসাহ দিয়েছি? তুমি বলো কি দিদি। এত বড় বেহায়াপনার অপবাদ তুমি আমায় দাও?

লাবণ্য। উৎসাহ দেওয়া আর বেহায়াপনা এক নয়। পুরুষমানুষকে উৎসাহিত করতেই হয়। তা না হলে কি কোনোও দিন এক পা-ও এগুবার ওদের সাহস হবে? এমনিতেই ওরা যা ভীতু! ভয় খাওঁয়াই ওদের স্বভাব।

ললিতা। গণেশবাবু ভীতু? এমন কথা আমি ভাবতেই পারি না। ওঁর ব্যাভার দেখে মনে হোলো এরকম একটা প্রস্তাব করতে হয় বলে করা। স্রেফ্ ফরম্যালিটি। তা ছাড়া কিছু নয়। আসলে এ ব্যাপারে আমার যেন বলবার কিছু নেই, দায় নেই কোনো!

লাবণ্য। তোর আবার দায়টা কিসের? বিয়ের সব ঝক্কি তো ছেলেদেরই পোয়াতে হয়। বিয়ের পর থেকেই তো!

ললিতা। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আমারও তো মতামত বলে কিছু থাকতে পারে। কিন্তু ওঁর ধারণা যে এ বিষয়ে আমার কিছুই বলবার নেই। আমি সায় দেব, দিতে বাধ্য, এটাই যেন স্বতঃসিদ্ধ। কেন বাপু, উনি কী করেছেন আমার জন্যে? ভাবখানা—যেন আমার মাথা কিনে রেখেছেন! এক এক সময় এমন রাগ হয় যে মনে করি—

[কী মনে করে সেটা সে উহ্যই রাখে]

লাবণ্য। খুব হয়েছে!

ললিতা। বাস্তবিক, এই পুরুষমানুষগুলো এমন গোঁয়ারগোবিন্দ কে জানতো আগে? মনে করে যেন ওদের মতন মেয়েরাও নিজেদের মতামত সব সময়ে তৈরি করে রেখেছে। আর যদি তৈরি করাও থাকে, ওঁদের মুখের কথা খস্‌লো কি, অমনি আমরা প্রকাশ করে ফেল্‌তে বাধ্য! এতই যেন গরজ মেয়েদের!

লাবণ্য। সত্যি! মেয়েদের ধরণই ওই। বিশেষতঃ তোর মতো মেয়েদের যারা সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। প্রেম করতে গিয়ে পরিণামে বিয়ে করতে হবে একথা তারা ভাবতেই পারে না। তারা চায় ছেলেদের অখণ্ড মনোযোগ—আর চায় এই মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা চল্‌তে থাকুক্ চিরদিন! কিন্তু রোমান্সও তো একদিন ফুরোয়—সব খেলার মতই শেষ হয়। কিন্তু সেই চূড়ান্ত পরিণতির দিকে মুখ ফেরাতে তারা রাজী হয় না কিছুতেই।

ললিতা। এজন্যে কি মেয়েদের খুব দোষ দেওয়া যায়?

লাবণ্য। লোকেরা তো মেয়েদেরই দোষ দিয়ে থাকে।

ললিতা। তারা সব একচোখো।

লাবণ্য। যা বলিস্।

ললিতা। কিন্তু মেজদি, বিয়ের মত একটা হেস্তনেস্ত ব্যাপারের আগে ভালো করে ভাববার যথেষ্ট সময় নেওয়া দরকার নয় কি? মেয়েকে নিজের মন জান্‌তে হবে না? নিজের বেলায় ভেবে ছাখো—তুমি নিজেও কি সময় নাওনি, মেজদি?

লাবণ্য। হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। নিয়েছিলাম বই কি। দু-মিনিট কেবল। বেনারস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উনি ভর্তি হয়েছিলেন, স্টেশনে যাবার পথে আমাদের বাড়ী এলেন। ট্রেন ধরার খুব বেশী সময় ছিল না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন। আমি বললাম—না। তারপরই কিন্তু তাঁর পিছনে দৌড়ে গিয়ে নিজের ভুল শুধরে নিলাম। তক্ষুনি তক্ষুনি।

ললিতা। [চোখ বড়ো বড়ো করে] বলো কি দিদি?

লাবণ্য। আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাববার সময় তুই পেয়েছিস্। আরো কত সময় তুই চাস্?

ললিতা। আমি বলেছি মধুপুর থেকে যাবার আগে জবাব দেব।

লাবণ্য। কেন, কী বল্‌বি এখনো ঠিক করতে পারিস্‌নি নাকি ?

ললিতা। জানি না। কী বলবো তাই তো ভাবছি !

লাবণ্য। বেশ তো, আয়। আয় আমরা দু'জনেই ব্যাপারটা ভেবে দেখি। আগাগোড়াই ভাবা যাক্‌। আচ্ছা বল্‌তো, প্রথম পরিচয়ের থেকেই ওর ওপর তোর মন পড়েছিল কি না ? ওকে তোর বেশ ভালো লেগেছিল, কেমন কি না ?

ললিতা। [ক্ষীণ স্বরে] হ্যাঁ, তবে তুমি যে রকমটি ভাবছো তা নয়। ও এক ধরনের ভালো লাগা—তোমাকে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না মেজদি। দেখতে মন্দ না, স্মার্ট, সব কাজেই একটা স্টাইল আছে—এই সবই—

লাবণ্য। বুঝেছি। তারপরে আরো একটু ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর এই ভালো লাগাটাই শেষে—

ললিতা। না, না, মেজদি। মোটেই তা নয়।

লাবণ্য। বেশ, তা না হোলো। তা হলে এখন এই মেলামেশার পরিণামে—?

ললিতা। বাঃ, সে তো একটু আগেই তোমাকে বললুম। সেই কথাই তো বলছি।

লাবণ্য। এই বিয়ের প্রস্তাব ? আজকের এই কাণ্ডটা ? তা—তা—এই প্রস্তাবের পর এখন তোর মনের অবস্থাটা কেমন ?

ললিতা। তাই নিয়েই তো মাথা ঘামাচ্ছি আমি। গণেশবাবুকে আমি ভালোবাসি কি না, ভালোবাসতে পারব কি না, উক্ত ভদ্রলোক ভালোবাসবার মতন কি না, গণেশ নামের কাউকে ভালোবাসা আধুনিক কোনো মেয়ের উপযুক্ত কি না, এ যুগে সেটা সম্ভব কি না—এই সবই তো ভাবছি।

লাবণ্য। এখনো ভাবছিস্‌ ?

ললিতা। ভাববো না ? আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে

মানুষটার ধরন। অদ্ভুত ধরন! ছেলেরা প্রেমে পড়লে এই রকমই হয় বুঝি! এর মধ্যেই ওর ধারণা হ'য়ে গেছে যে আমি যেন ওঁরই জিনিস।

লাবণ্য। তুই ওঁর জিনিস! ওঁর এই ধারণাটাই কি ওঁকে তোর না পছন্দ করার কারণ?

ললিতা। তা বলতে পারি না। কিন্তু কি রকম অদ্ভুত ধারণা ভাবো তো মেজদি! এ রকম ধারণা কারো হয় কেন?

লাবণ্য। এতক্ষণে বুঝলাম।

ললিতা। কী বুঝলে?

লাবণ্য। আমার মনে হয় যে তুই—

ললিতা। কী! থাম্‌লে কেন?

লাবণ্য। তুই গণেশবাবুকে—

[ঠিক এই মুহূর্তে দেবেনবাবুর প্রবেশ। আর তাঁর প্রবেশমাত্র ললিতার অন্য ঘরে লতিয়ে যাওয়া।]

লাবণ্য। ওগো শুন্‌ছো? [গলার স্বর বেশ ভারী করে] কী হয়েছে জানো কিছু?

দেবেন। না জানি না তো। তবে জেনে নেব। তুমি নিজেই যখন সশরীরে বর্তমান আছো তখন—এখন জানতে কতক্ষণ?

লাবণ্য। না, ঠাট্টার কথা নয়। তোমাকে নিয়ে কি করা যায় বল তো? সব কথাই তুমি হেসে উড়িয়ে দাও! কবে যে একটু বুঝ্‌দার হবে? সত্যি, ভারী বেয়াড়া ব্যাপার। বুঝেছো, গণেশবাবু—গণেশবাবু বুঝলে?

দেবেন। হ্যাঁ, বুঝেছি। গণেশবাবুকে বুঝতে পারা এমন কিছু শক্ত নয়!

লাবণ্য। ছাই বুঝেছো! গণেশবাবু লতুর কাছে বিয়ের কথা পেড়েছেন আজ।

দেবেন। [চম্‌কে গিয়ে] অ্যাঁ, বলো কি ? [তারপর সামলে নিয়ে] তা, তাতে আর কি হয়েছে ?

লাবণ্য। কী হয়েছে ? অবাক্ করলে তুমি ! নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। বুদ্ধিশুদ্ধি কোনোকালে আর হবে না তোমার ! ঐ হোঁৎকা গণেশবাবুর সঙ্গে কি না আমাদের লতু— তুমি বলো কিগো ? মাথা খারাপ হোলো নাকি তোমার ?

দেবেন। তা বটে, ওটা একটু হোঁৎকাই বটে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল তুমি ছোক্‌রাকে একটু পছন্দই করতে।

লাবণ্য। পছন্দ আমি কোনোদিনই করিনি ! তবে আমি ভেবেছিলুম যে গণেশবাবুর সঙ্গেই যদি সম্বন্ধটা বেঁধে যায় তো এমন মন্দ কি !

দেবেন। মন্দ কি ? তা, সেটা বাঁধছে না কেন ? লতু— লতুরও কি ওকে অপছন্দ ?

লাবণ্য। সে এখনো কিছু ঠিক করতে পারে নি।

দেবেন। তবে তো মুস্কিল—ভারী মুস্কিল তো তাহলে ! পছন্দ কি না ঠিক করে উঠতে না পারলে কি করে বিয়ে হবে ? বিয়ের পরে ওসব খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে যায়, কিন্তু বিয়ের আগে ? উঁহু, পছন্দ চাই-ই।

লাবণ্য। নিশ্চয়।

দেবেন। লতু কি জবাব দিয়েছে গণেশকে ?

লাবণ্য। বলেছে মধুপুর ছাড়বার আগে জানাবে।

দেবেন। সে তো এখনো এক মাসের ধাক্কা। এখনো তো আমরা আরো একমাস এখানে কাটাবো। হাওয়া বদলাতে এসে—কারো মতামতের অপেক্ষায়—হুট্ বললেই তো ছুট্ দেওয়া যায় না ?

লাবণ্য। কি করা যাবে !

দেবেন। লতুর পছন্দের প্রত্যাশায় কি এই একমাস—এতদিন ধরে বেচারীকে খাবি খাওয়ানো ঠিক হবে? এত সময় হাতে পেলে ভেবেচিন্তে সে হয় তো আত্মহত্যাও করতে পারে। হার্টফেল করাও শক্ত নয়।

লাবণ্য। আমি তার কী করেছি!

দেবেন। ভারী হাঙ্গাম তো? আচ্ছা, আমি লতুর সঙ্গে কথা কই। দেখি পছন্দ করানো যায় কি না?

লাবণ্য। তা হলেই তুমি গোল পাকাবে। অমন কাজটিও করো না।

দেবেন। কেন, আমি কি কথা কইতে জানি না?

লাবণ্য। দেখো, খুব সাবধান কিন্তু! লতু কি রকম সেন্‌সিটিভ মেয়ে জানো তো?

দেবেন। জানি জানি, খুব জানি। তোমার বোন, সে কি আর জানিনে। আমাকে আর তোমার অত করে বোঝাতে হবে না।

লাবণ্য। কিছু বেমাক্কা বলে বোসো না যেন!

দেবেন। তা কেন বলব?

লাবণ্য। খুব আস্তে আস্তে কথাটা পেড়ো, বুঝলে? মেয়েদের মন হচ্ছে কাচের বাসন। কাচের বাসনের মতই ভারি ঠুন্‌কো, কথার ঘায়ে বাজানোও যায়, ভাঙাও যায় তেমনি আবার!

দেবেন। সাহিত্য করতে সুরু করলে যে।

লাবণ্য। আমাদের মনের কী জানবে তোমরা? আমরাই জানিনে। সত্যি, বোকার মত যা-তা বলে বোসো না যেন। ছিপি খুলে একটু বুদ্ধি না হয় খরচই করলে। জীবনে একটা দিন একটু হাঁদা না হলেও তেমন বিশেষ ক্ষতি হবে না তোমার।

দেবেন। ভেব না, ভেব না। খুব কৌশলে আমি কথাটা

পাড়বো। হঠাৎ কিছু বলব না। সোজাসুজিও বলব না। ফস্ করে বেফাঁসও কিছু নয়। খুব ঘুরিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ইন্‌ডিরেক্‌ট্‌লি কথাটা পাড়বো। কায়দা করে পাড়তে হবে তো। ছাখো না কি করি!

[লতুর প্রবেশ। ওর মুখের চেহারা দেখলে মনে হয় একটু আগে ও কেঁদেছে। লাবণ্যের চোখে তা ধরা পড়ে। দেবেন কথা পাড়তে যায়, লাবণ্য হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে, যার মানে হচ্ছে, এখন নয়, এখনই নয়, ওকথা নয় এখন। কিন্তু সে ইশারা উনি গ্রাহ্যই করেন না। ওর সমস্ত মুখ তখন ভয়ানক খুশিতে ভরাট।]

দেবেন। এই যে লতু! হোঁৎকা গণেশটা কী বলছিলো আজ তোমায়?

[লাবণ্য সোফায় এলিয়ে পড়ে। কে যেন তাকে গুলি করেছে। লতু কোনো জবাব দেয় না। কথাটি যেন শুন্‌তেই পায়নি।]

দেবেন। বিয়ের কথা পেড়েছিলো বুঝি? হোঁৎকা কোথাকার!

[লাবণ্য ছু-হাতে মুখ ঢাকে। লতু যেমন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত এসেছিল, তেমনি নিঃসাড়ে চলে যায়।]

দেবেন। আচ্ছা মেয়ে বাবা! বেশ একখান্ লেডি ম্যাক্‌বেথিশ স্টাইল ঝেড়ে গেল। এমন নিশির-ডাকে পাওয়ার আর্টিস্‌টিক অভিনয় থিয়েটারেও কোনোদিন দেখিনি।

লাবণ্য। সর্বনাশ করলে!

দেবেন। তুমি যদি অমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ইনিয়ে বিনিয়ে, কায়দা করে কথা কইতে না বলতে, পুরুষমানুষের মতো সোজাসুজি কথা পাড়তে দিতে আমায়—

লাবণ্য। দোহাই! তোমার পায়ে পড়ি। আর তোমাকে কথা কইতে হবে না।

দেবেন। কইবোই না তো? আধখানা কথা পেটে, আধখানা মুখে—অমন করে কথা বলতে মেয়েরাই পারে কেবল! আমাদের বাপু সোজাসুজি কথা। আমরা পুরুষমানুষ—যা বলবার চট্‌পট্‌ বলে ফেলতেই ভালবাসি। নাঃ, তোমাদের এইসব মেয়েলি আদিখ্যেতায় আমি নেই। আমি চান করতে গেলাম।

[ভিতরে গেলেন]

লাবণ্য। চলো, তোমার তোয়ালে-সাবান দিই।

[স্বামীর অনুসরণ। ভিতর থেকে ললিতা আসতেই বাহির হইতে গণেশের প্রবেশ।]

গণেশ। [নরম গলায়] লতু!

ললিতা। না, একটি কথাও না এখন।

গণেশ। [ভেতরের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে] ও, তোমার দিদি আর দেবেনবাবু ঐ ঘরে বুঝি? বুঝেছি। তা আমাদের সব ঠিক তো তাহলে?

ললিতা। মেজদিকে বলেছি আমি।

গণেশ। অ্যাঁ? সমস্ত? বলো কি? আজ রাত্রে এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে আমাদের বিয়ের কথাও?

ললিতা। সে সব প্ল্যান কি আউট্‌ করি। পাগল!

যবনিকা

নেহাৎ ছোটদের জন্য নয়
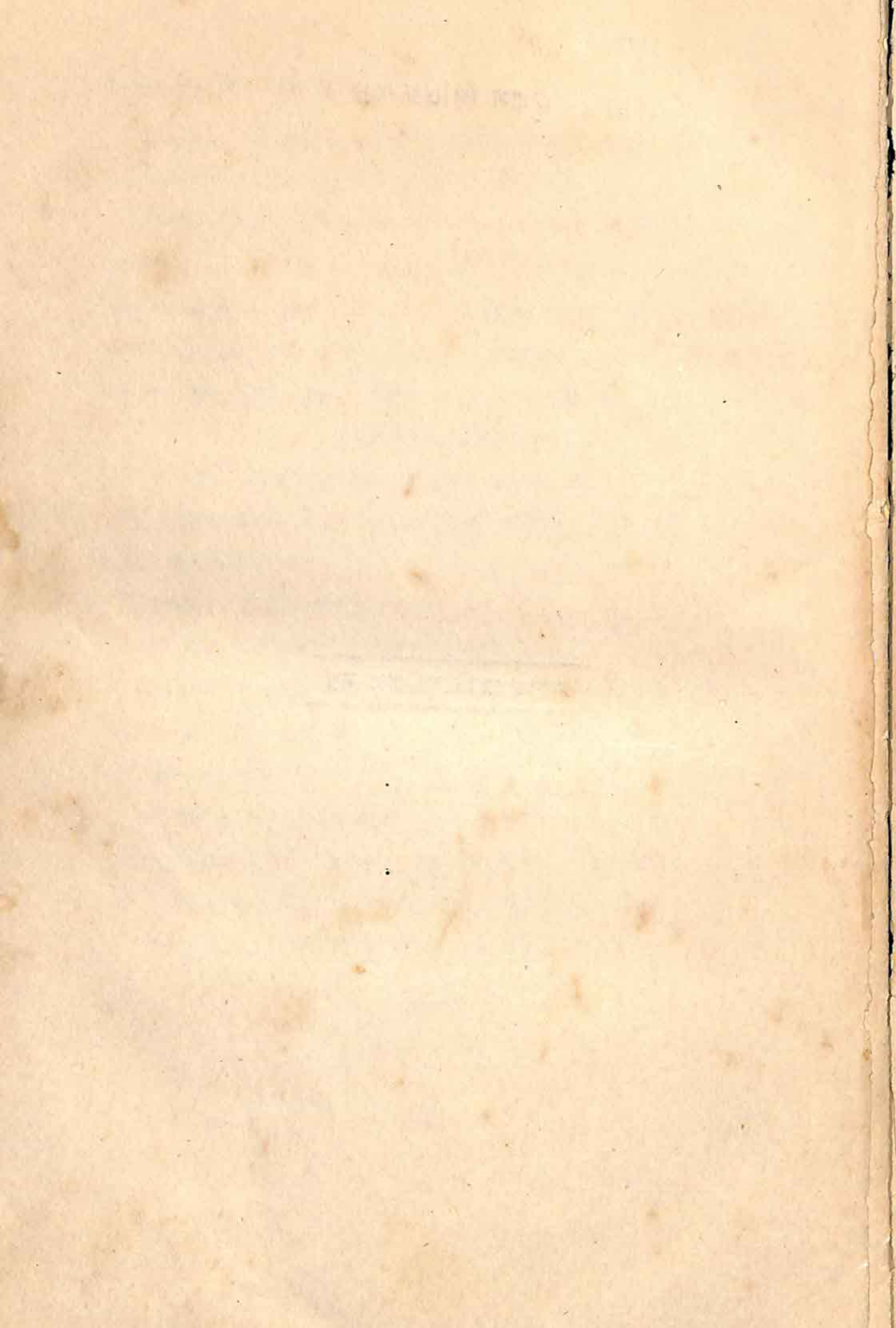
প্রেম বিচিত্র বস্তু

প্রথম দৃশ্য

কফি হাউস। মহীতোষ ও আমি।

আমি। কী হে! কী হোলো তোমার? মুখ এমন ভার ভার কেন?

মহীতোষ। মেয়েদের কথা আর বোলো না! ছোঃ!

আমি। কেন মেয়েদের ছোঁ মারার মত কী হোলো তোমার আবার?

মহী। শুনলে তুমি দুঃখিত হবে বন্ধু, বিনীতা আর আমার মধ্যে বাক্যালাপ নেই। কথাবার্তা বন্ধ—চিরদিনের মতই। এমন সব তথ্য দিবালোকে প্রকাশলাভ করেছে যাদের দিবালোকে প্রকাশলাভের একটুও আবশ্যকতা ছিল না।

আমি। বিনীতা বুঝি সব খবর জানতে পেরে গেছে?

মহী। ধরেছো ঠিক।……কিন্তু আমি এর হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বো না। তা তুমি দেখে নিয়ো। ঐ বরেন হতভাগাকে দেখে নেব আমি। একদিন রাত্রে অলিগলির মধ্যে অন্ধকারে একবার পেলেই হয়। এই কব্জির কয়েক ঘুঁষিতে ওর ওই বিচ্ছিরি চেহারা যদি না বদলে দিই।……এমন মার লাগাবো যে চাই কি—তার চোটে হয়তো দেখতে ও ভালোই হয়ে যেতে পারে।

আমি। বরেন? বরেনই বুঝি এই কাণ্ড করেছে? বেফাঁস করে দিয়েছে সব?

মহী। হ্যাঁ, সে-ই বাধিয়েছে এই ফ্যাসাদ। ও হতভাগার নিজেরই একটু টান রয়েছে কিনা সুষির ওপর। আর সুযোগ পেয়ে—! আমারই বোকামি। সুষমার প্রেমপত্র বাহাদুরি করে

ওর কাছে পড়তে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছিল। মানুষের ভেতরেও যে দু'মুখো সাপ থাকে তা'তো জানতুম না।

আমি। দু'মুখেই ছোবল দিয়েছে বুঝি? দু'দিকেই? সুষমাকেও বাগিয়েছে আর এদিকে বিনীতাকেও ভাগিয়েছে? নাকি—আবার বিনীতার সঙ্গেও প্রেম করার তালে রয়েছে সেই সাথে?

মহী। সুষমার আর আমার—আমাদের ভেতরকার সমস্ত ব্যাপার চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে বিনীতাকে। তার ফলে— তার ফলে—

[পরবর্তী ফলাফল মহীতোষ নিজের ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারে না]

আমি। তার ফলে—অর্থাৎ তোমার আর বিনীতার মাঝখানে সুষমা আসার ফলে—তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে সুষমা ছিলো তা' তিরোহিত হয়েছে। আর্থাৎ কিনা সুষমা এসেছে বটে, কিন্তু সুষমা আর নেই—এই তো?

মহী। তার ফলে—এই চিঠি ছ্যাখো—বিনীতার চিঠি।

আমি। না, থাক! কাজিন হলেও বোন তো? নিজের বোনের প্রেমপত্র নিজে দেখা কি উচিত?

মহী। না, প্রেমপত্র নয়।

আমি। তা হলেও তোমাদের অনুরাগের ব্যাপারে আমার মাথা গলানো—

মহী। অনুরাগের নয়, রাগের চিঠি। কী সব লিখেছে ছ্যাখো না! পড়লে অবাক্ হবে।

আমি। অবাক্ হবার কিছু নেই ভাই।

মহী। কিছু নেই? বলো কি তুমি? বিনীতার মতো মেয়ে—অমন চমৎকার মেয়ে কোন এক বাজে লোকের লেখা একটা উড়ো চিঠিতে বিশ্বাস ক'রে—তা' করা কি তার ঠিক হয়েছে?

আমি। মেয়েরা অমনই? আর বিনি মেয়েই তো? মেয়েরা এই ধরনের অভিযোগে আস্থা স্থাপন করতে একটুও দ্বিধা করে না। এর জন্যে একেবারে দণ্ড দিতেও তাদের বাধা নেই।

মহী। বিনীতা আর সব মেয়ে সমান?

আমি। এ ব্যাপারে অন্ততঃ। এ হেন ব্যাপারে অত্যন্ত বিনীতাকেও এক মুহূর্তে দুর্বিনীতা হয়ে উঠতে দেখা গেছে। এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তোমায় আমি দিতে পারি। আমার ভূয়োদর্শন থেকেই……

মহী। ওসব ভূয়ো কথা রাখো। দর্শনের কথা যাক্—এখন করি কী, তাই বলো। বিনীতার সঙ্গে দেখা হলে কী বলবো সেই কথাই আমি ভাবছি।

আমি। এই যে বললে তোমাদের বাক্যালাপ বন্ধ, বাৎচিৎ খতম্ চিরকালের মতই? বললে না?

মহী। আমি তো খতম্ করিনি। ও-ই আর কথা বলবে না বলে দিয়েছে। আরো বলেছে যে এমন কতকগুলো কথা সে আমাকে বলতে চায় যা ও চিঠিতে লিখে উঠতে পারলো না। সে-সব নাকি লেখনীর মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব। অন্ততঃ, কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে। রোববার দিন ওদের বাড়িতে যেতে লিখেছে আমায়।

আমি। বেশ তো, যাবে, তার কি! গিয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ করবে। সমস্ত স্রেফ্ অস্বীকার—বুঝেছো? তা' ছাড়া তো আর কোনো পথ দেখিনে তোমার।

মহী। অস্বীকার? উঁহু। কোনো লাভ নেই। কিস্সু হয় না তাতে। দারোগা আর মেয়েদের কাছে 'ডিনাই' করে কোনো ফল হয় না ভাই। কি করবে বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত ওরা কবুল করিয়ে ছাড়ে। [বিষণ্ণভাবে সে ঘাড় নাড়ে।]

আমি। তা' হলে—তা' হলে আর কী করবে।……যাক্, এর থেকে অবলা সরলা কুমারীর সঙ্গে ছলনা করাটা যে কত খারাপ, এই শিক্ষাই তোমার হোলো। সেইটেই লাভ।

মহী। কি বলবো বন্ধু! যদি সশরীরে, প্রাণ থাকতে, এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে উৎরোতে পারি তা' হলে আর কখনও সুষমার পথ মাড়াচ্ছিনে। ভুলেও ওর দিকে দৃক্‌পাত করবো না। যদি বাঁচি তো, বিনীতার পায়েই বিনীত হয়ে থাকবো সারা জীবন। দিব্যি গেলে বলছি, তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু কথা হচ্ছে, দাবানল থেকে জ্বলজ্যান্ত বেরিয়ে আসতে পারবো বলে তো বোধ হয় না।

আমি। দাঁড়াও, একটা উপায় ঠাওরাই।…এক কাজ করো। হ্যাঁ। সুষমাকে তোমার পিসীমা কি দিদিমার সগোত্র বলে চালিয়ে দাও না? এই একমাত্র উপায়। বলো যে—উনি খুব বুড়ো-সুড়ো, ওঁকে দেখলে তোমার মায়ের কথা মনে পড়ে—আর সেই জন্যেই ওঁকে না দেখে তুমি থাকতে পারো না।

মহী। সুষমা মোটেই বুড়ো-সুড়ো না। তা'ছাড়া ওকে দেখলে মা'র কথা আমার মনেই পড়ে না। তা'ছাড়া…তা' ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা হবে যে।

আমি। তা হলে—তা হলে আর কী হবে! প্রেম আর সত্যবাদিতা এক সাথে চালানো যায় না। দু'টোই একসঙ্গে বজায় রাখা অসম্ভব।

মহী। আচ্ছা, বলো শুনি। [একটু উৎসুক হয়ে] শুনি তোমার কথাটা।

আমি। সুষমাকে মা বলে তোমার মনে না হলেও বিনির তো তা' মনে করায় বাধা নেই। তুমি করবে কি, মাতৃতুল্য কি দিদিমাতুল্য বলে ওর কাছে জাহির করার সময়ে দেখবে যাতে

সুষমার একটা ফটো হঠাৎ তোমার পকেট থেকে ওর সামনে পড়ে যায়।

মহী। কি করে পড়বে ?

আমি। ধরো, বুক-পকেটে রেখেছিলে। কোনো কারণে ঝুঁক্তে গিয়ে পড়ে গেল ফস্ করে। আর ফটোটা যাতে ওর নজরে পড়ে, নজর রাখবে সেদিকে।

মহী। প্রাণ থাকতে নয়। সুষমার চেহারা যদি ও ছাখে—

আমি। শোনো আগে। অশীতিপর হলেই ভাল হয়, নেহাৎ না মেলে, ষাট বছরের কোনো আধ-বুড়ির ফোটো পেলেও হবে। তা' তুমি যোগাড় করতে পারবে নিশ্চয়ই ? পাড়াতুতো কোনো মাসির ছবি পাড়াটে মাস্তুতো ভাইয়ের কাছ থেকে বাগাতে পারবে তা ? সেই ফটোর ওপর, 'স্নেহের শ্রীমান্ মহীতোষকে, আশীর্বাদিকা শ্রীমতী সুষমা দেব্যা', এই কথাগুলি কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ো— ঐ কথাগুলিই বা ঐ জাতীয় কিছু বুঝেছো ?

মহী। হ্যাঁ।

আমি। তারপর, বিনীতা ওই ফোটো কুড়িয়ে নেবে—আর তোমার সত্যবাদিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে। হুবহুই দেখতে পাবে। আর মুহূর্তের মধ্যেই—

মহী। দাঁড়াও, এক মুহূর্ত। ব্যাপারটা বুঝতে আমায়—

আমি। বুঝবার কিছু নেই। মুহূর্তের মধ্যেই বিনীতার অমূলক সন্দেহ উড়ে যাবে কোথায়! অকারণে তোমার মতন এমন একনিষ্ঠ প্রেমিককে অবিশ্বাস করার জন্যে সবিনয়ে সে তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করবে। তখন পুনর্বিনীতাকে তুমি ফিরে পাবে পুনরায়। ...এ প্ল্যানটা তোমার, অ্যাঁ, কেমন লাগে ?

মহীতোষ। [আমার কথার জবাব না দিয়ে] এই বোয়!

বোয়। জী হুজুর।

মহী। এই বাবুকে এক কাপ কপি দাও।...আউর দো পিলেট কাজু বাদাম...আউর চার পিলেট পটাটো চিপ্‌স্‌...আউর আউর আট পিলেট...

আমি। রক্ষে করো ভাই? আমি বরেন নই, আমাকে খুন করে কী হবে? এক কাপ কফিই যথেষ্ট আর এক প্লেট ..[কফিতে চুমক দিয়ে] তা' হলে কবে দেখা করছো বিনির সঙ্গে?

মহী। এই রোববারেই।

আমি। এর মধ্যে কারোও একটা ক্যামেরা ধার ক'রে পাড়ার প্রৌঢ়াদের তাড়া করে বেড়াও। বঁড়শি হাতে বর্ষীয়সীদের পিছু পিছু ফেরো। না—তাই বা কেন? আমাদের মণ্টুর কাছেই তো গাদা গাদা ফোটো রয়েছে—তার তোলা তার দিদিমার ফোটো। নানান্ পোজের। চকোলেট, লজেঞ্চুস কিছু দিয়ে ওর একটার ওপর ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেই তো হয়। ছেলেমানুষের লেখা আর মেয়েমানুষের লেখা প্রায় একাকার—মানে, সেকেলে মেয়ের আর একেলে ছেলের একরকমের দেবাক্ষর। তাই না?

মহী। শুধু হাতের লেখাতেই না, কার্যতও! মেয়েদের ছেলেমানুষী দেখে দেখে তাই আমার ধারণা হয়েছে।

আমি। বেশ। কিন্তু মনে রেখো এর পরে আর সুষমার কোন ব্যাপারে তুমি নেই? তাই তো?

মহী। খুব সম্ভব, না। আবার? তা' ছাড়া, সে সুযোগ পেলে তো আমি? বরেন সে ছেলেই নয়। কোনোদিকে কোনো ফাঁক রাখবার ছেলে কি সে? সুষমার কথা সে বিনীতাকে বলেছে, আর বিনীতার কথা সে সুষমাকে বলেছে, আবার বিনীতার কথা যে সে সুষমাকে বলেছে একথা সে বিনীতাকে বলেছে আর সুষমার কথাও সে যে বিনীতার কাছে বলেছে একথা...

আমি। হয়েছে, হয়েছে! বুঝতে পেরেছি। আর বুঝাতে

হবে না। মানে, বিপথে যাবার কোনো ফাঁক সে খোলা রাখে নি। এই তো?

মহী। গেলে তো বিপথে? ফের আর আমি গোলোযোগের মধ্যে যাই? তুমি বলছো কী বন্ধু? প্রাণ থাকতে না। এ জীবনে নয়। এর পর থেকে—ভবিষ্যতে, সুদূরতম ভবিষ্যতেও—একনিষ্ঠার সরল দারু পথটি ছাড়া দ্বিতীয় পথ আমার নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কফি হাউস। মহীতোষ কফি খাচ্ছে। আমার প্রবেশ।

আমি। কী হে? খবর কী? মিটে গেছে তো সব? মিটমাট তো?

মহীতোষ। হ্যাঁ বন্ধু। মিটে গেছে। চিরদিনের মত। বিনীতার সঙ্গে আমার কথাবার্তা বন্ধ। জন্মের মতই এবার।

আমি। অ্যাঁ? সে কী হে? ফটোর ব্যাপারটায় সুবিধে হলো না বুঝি?

মহীতোষ। হয়েছিল, হয়েছিল—কিছুদূর। আমার দোষেই গড়বড় হয়ে গেল শেষটায়। তোমার বিনীতা তো আর বোকা মেয়ে নয়, দুই আর দুই যোগ করে চার বার করা তার পক্ষে শক্ত নয় তো। [আধ মাইল চওড়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে] আমারই অবিমৃষ্যকারিতা। তোমার ভাষায় বলতে গেলে অবিমিশ্রকারিতাও বলা যাও।

আমি। এর মধ্যে অবিমৃষ্যকারিতা আসছে কোথা থেকে?

মহীতোষ। দু'টো ফটোই আমি এক পকেটে রেখেছিলাম কিনা। এই বুক-পকেটেই আর দু'টোই পকেট থেকে একসঙ্গে পড়ে গেল।

আমি। দুটো ফটো—তার মানে? একই মেয়ের দুই ফটো?

মহীতোষ। তোমার মনে তো তবু একটা প্রশ্ন জেগেছে—কিন্তু বিনীতা! সেই ফটো দু'খানা দেখে আর একটি কথাও না। কোনো কৈফিয়ৎ—কেন—কী বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করা দূরে থাক্—আমার দিকে চাইলো না পর্যন্ত। বোমার মতন মুখখানা করে, না-ফোটাই হাউইয়ের মতই উড়ে গেল। হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গেল তক্ষুনিই।

আমি। কেন, মণ্টুর দিদিমা কি তার চেনাজানার মধ্যেই না কি? ধরা পড়ে গেলে বুঝি?

মহীতোষ। তা' নয়, ধরা পড়লাম বটে, তবে সে-দিক থেকে না। যেমনি না সেই ফটো দু'টো দেখলো সে—দু'টোই—সেই বিশ্রী প্রমাতামহীর—আর, তার একটাতে লেখা 'কল্যাণীয় শ্রীমান্ মহীতোষকে, ইতি আশীর্বাদিকা শ্রীমতী সুষম্যা দেব্যা' আর অপরটায়—[মহীতোষ একটু থামে]

আমি। আর অপরটায়?

মহীতোষ। অপরটায় 'কল্যাণীয় শ্রীমান্ মহীতোষকে, ইতি শ্রীমতী বিনীতা দেব্যা'—।

আমি। কিন্তু কেন? এই অপরটায় তোমার কি দরকার ছিলো শুনি?

মহী। সুষমা সেন সেটিকে মাটি থেকে কুড়োবেন সেইজন্যেই। কেন আবার?

যবনিকা

উদ্বাস্তবিক

নেহাৎ ছোটদের জন্য নয়

উদ্বাস্তবিক
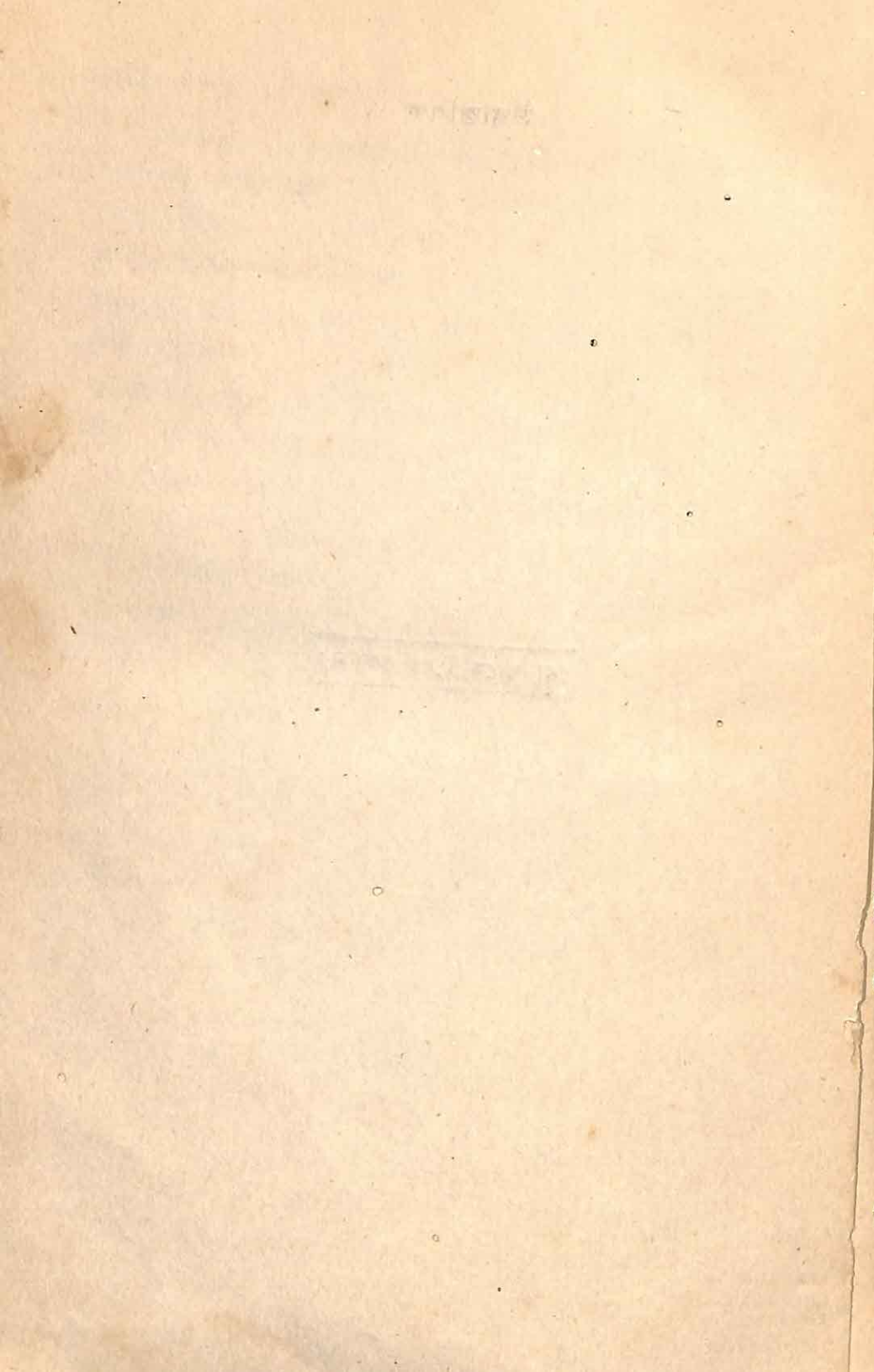
অর্ধভগ্ন পুরাতন এক রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ।
ঘরের আসবাব-সজ্জা সেকেলে।
পাত্র-পাত্রী ঃ সার্ হরিশরণ আর রাণী বিলাসমণি।

রাণী বিলাসমণি এতক্ষণ ধরে কান খাড়া করেছিলেন, এবার তিনি চোখের তারাও তুললেন—

রাণী। ওগো শুনছো? শুনতে পাচ্ছো?

সার্। কী! কী শুনবো?

রাণী। ঐ! ঐ যে! কিসের শব্দ ও? আধঘণ্টা ধরেই শুনছি আমি।

সার্। ঐ ঠুক্‌ঠাক্, খুটখাট? ইঁদুরের বাঁদরামি—তা' ছাড়া কী? এই পোড়ো বাড়িতে কি কোনো মানুষ আসে কখনো? কে এখানে মরতে আসবে?

রাণী। পোড়ো বাড়িই যাদের আশ্রয়স্থান?

সার্। কার এমন পোড়া কপাল? মরে ভূত হবার আগে কি কেউ—

রাণী। ঐ শোনো—ঠকাস্! পেয়েছো শুনতে?

সার্। না।

রাণী। কানের মাথা খেয়ে বসে আছো, শুনবে কোথা থেকে?

সার্। কান ধরে কথা বোলো না বলছি কিন্তু—[সার্ হরিশরণের রাগ হয়।]

রাণী। কারা যেন কানাকানি করছে কোথায়? কানে আসছে না তোমার? খট্‌খটানির সঙ্গে ফিস্‌ফিসানি আওয়াজ—আধঘণ্টা ধরে বেশ স্পষ্ট শুনছি আমি। কোথায় হচ্ছে বলো তো?

সার্। তোমার মাথায়। মাথার পোকারা নড়চড় করছে, তারই আওয়াজ।

রাণী। মাথা তুলে কথা? আবার সেই? আমার মাথা নিয়ে কথা বোলো না বলছি। আমার মতন মাথা তোমার থাক্‌লে—

সার্। তেমাথার বেলগাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হোতো অ্যাদ্দিনে। এই ভিটেটুকুও থাকতো না।

রাণী। আহা, ভারী তো ভিটে! কতোবার তোমায় বলেছি ভূতের মতন এখানে না পড়ে থেকে চলো বাগ্‌নাপাড়ায় যাই। আহা, কী জায়গা! কেমন আমবাগান! তারপর আমার মা আছেন সেখানে। তা বুড়ো জামায়ের মাথা কাটা যায় শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাক্‌লে।

সার্। বাগ্‌নাপাড়ার কথা আর বোলো না বাবা! মাগ্‌না থাকতে পেলেও কোনো হাঘরে সেখানে মরতে যাবে না।

রাণী। চুপ্! ঐ! ঐ আওয়াজটা কিসের?

সার্। হাওয়ার।

রাণী। না, হাওয়া নয়। হাওয়ার আওয়াজ কখনো এরকম হয় না।

সার্। কেমন ঝড়ের একটা সাঁই সাঁই শোনা যাচ্ছে যেন! তবে সেটা তোমার হাঁপানিরও হতে পারে। তোমার পুরোনো হাঁপানিটা অনেকদিন পরে চেগেছে—মাথা চাড়া দিয়েছে দেখছি আবার।

রাণী। ফের মাথা তুলে কথা? আমার হাঁপানি? আমার হাঁপানি নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমার লজ্জা করে না? বাহাত্তুরে বেতো রুগী। [নেপথ্যের দড়াম্ শব্দে চম্‌কে উঠে] ঐ—ঐ দড়াম্! ও কি?

সার্। দরজা। কিম্বা জানালাও হতে পারে। জানালার ভাঙ্গা পাল্লা হাওয়ায় নড়ছে।

রাণী। ফের হাওয়া? বলছি হাওয়া নয়। কার যেন পায়ের আওয়াজ পেলাম।

সার্। তাহলে সেই বেহ্মদত্যি। অশত্থগাছ থেকে নেমে আমাদের বাড়ি এসে পায়চারি করছে।

রাণী। কতোবার বলেছি অশত্থগাছটা কাটাতে। শুনেছিলে তখন সে-কথা? বাড়ির পাশে কেউ অশত্থগাছ রাখে?

সার্। বিশ্বাস করিনি তখন। বেহ্মদত্যিরা বেলগাছেই থাকে —এই জানি। তেমাথার বেলগাছ ছেড়ে সে যে আমাদের অশত্থগাছে এসে উঠবে তা' আমি ভাবতে পারিনি। তবে এখন বুঝতে পারছি—[হরিশরণ চোখ মট্‌কায়]

রাণী। কী! কী বুঝতে পারছো? শুনি?

সার্। মূল কারণ তুমি। তোমার টানেই ঐ বেহ্মদত্যিটা—, হারাণখুড়োর বেঁচে থাকতে বেশ ঝোঁক ছিলো তো তোমার ওপর!

রাণী। ছিঃ! যদিও দূর-সম্পর্কের—তা'হলেও খুড়্‌শ্বশুর তো! তাঁর নামে এমন কথা বোলো না।

সার্। বাগে পেলে ঘাড় মট্‌কে দিতে পারে—এখনো? কী বলো?

রাণী। তা', তেমন রাগের মাথায় পেলে—[চম্‌কে উঠে] ঐ! ওই গো! শুনলে?

সার্। আল্‌গা দরজা হাওয়ার চোটে নড়ছে—তা'রই শব্দ। ছিঃ, এইটুকুতেই অধীর হ'লে চলে? এতই যদি তোমার ভয় তো তোমার মাকে এনে এখানে রাখলেই পারতে!

রাণী। মা? আমার মা—তিনি আসবেন এখানে?

জামাইয়ের এই পোড়ো বাড়িতে? বাগ্‌নাপাড়া ছেড়ে—তাঁর অমন সাধের বাগান ফেলে—মরতে আসবেন এই প্রেত্‌পুরীতে?

সার্। তা' কেন আসবেন? থাকুন তিনি তাঁর আমবাগানে—গলায় দড়ি দিয়ে। ঝুলতে থাকুন্! যেমন ভাগ্যি করে এসেছেন!

রাণী। আহা! আমরাই যেন কতো ভাগ্যিমন্ত! বলতে তোমার লজ্জা করে না?

সার্। কেন, লজ্জা কিসের? কী অভাগ্যিটা দেখলে আমাদের?

রাণী। এই তো বাড়ি! আড়াই ধার তা'র ধ্বসে গ্যাছে—একটা দিক—আমাদের দিকটা দাঁড়িয়ে আছে শুধু কোনোগতিকে। এই তো বাড়ির ছিরি!

সার্। আজ না হয় আড়াই ধার এর খাড়াই নেই, কিন্তু একদিন? একদিন তো এই চারমহলা বাড়ি গম্‌গম্ করতো! কতো লোক! কি রকম আলো! কেমন ঘটা! ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলতো ঘরে ঘরে। যত্নের অভাবে সেই বাড়ির আজ না-হয় এই দশা দাঁড়িয়েছে। তা' বলে—

রাণী। হাঘরেরাও এমন বাড়িতে থাকে না। আমাদের কোন গতি নেই তাই! এমন বাড়িতেও এখন আবার উপদ্রব সুরু হোলো! হানাবাড়ি হ'য়ে উঠলো এর মধ্যেই। সত্যি বলবো? সেই মঙ্গলবার থেকেই আমার যেন গা ছম্‌ছম্ করছে! কেমন-কেমনই লাগছে আমার।

সার্। কোন্ মঙ্গলবার?

রাণী। সেই যে গো—যে মঙ্গলবারে অমাবস্যা আর তেরস্পর্শ একসাথে পড়লো—সে-দিন থেকেই—

সার্। এখনো তোমার তেরোস্পর্শরাই গেল না? মঘা,

অমাবস্যা, বারবেলা, উত্তরে যোগিনী—এইসব নিয়ে এখনো চলতে হবে আমাদের ?

রাণী। না, বলছিলাম সেই কথা। সেই অমাবস্যার রাত্তিরেই আমার চোখে পড়লো প্রথম। আব্ছায়ার মতন কী যেন দেখতে পেলাম বাড়ির ছাঁচতলায়! ছায়া-ছায়া কারা যেন! তারপর থেকেই এইসব খুট্খাট্ লেগে রয়েছে। তুমি যেন না-জানা না-শোনার ভাণ করছো। পাছে তোমায় গিয়ে দেখতে বলি সেই ভয়েই।

সার্। ভয় ? আমার ভয় ? সার্ হরিশরণের ভয় ? তুমি হাসালে গিন্নী! অসার জীবন যাদের—তারাই শুধু ভয় খায়! সার্ হরিশরণ আর ভয় খায় না। বলো, মরার কি আমি আর পরোয়া করি ?

রাণী। তোমার কি আর মরণ আছে! তা'হলে তো বাঁচতাম!

সার্। কাপুরুষরাই বার বার মরে। কিন্তু আমি—আমাকে মারতে পারে এমন কোন শক্তি এখন কার ? কারো আছে আর এই দুনিয়ায় ? গীতার সেই—সেই শ্লোকটা জানোতো গিন্নী। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি—

রাণী। অং বং রাখো। আর ঢং করতে হবে না। ঐ! শুন্ছো, নীচে খল্খল্ ক'রে কে হাসছে ? না কি, কানে আসছে না তোমার ? পায়ের শব্দ পাচ্ছো না ? এ-ঘর থেকে ও-ঘর—ঘুরঘুর করছে—ঘুরে বেড়াচ্ছে কারা ? এ-সব শুনেও যদি কালার ভাণ ক'রে ন্যাকা সেজে ব'সে থাকো—প্রতিকারের কোনো চেষ্টা না করো তো আমি আর কী বলবো!

সার্। পাগল! এ-বাড়িতে আমরা দু'টি ছাড়া আর তৃতীয় প্রাণী নেই। জনমনিষ্যি না।

রাণী। আমি কী বলছি ? কাদের কথা বলছি বুঝতে পারছো

না? যাদের নাম করতে নেই—ছায়া মাড়াতে নেই যাদের, তারা যদি এ-বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়, তা'হলে তো আমরা গেছি! দফা সেরেছে আমাদের! একদণ্ড তিষ্ঠোতে দেবে না এখানে। সুখ তো ছিলই না, তা'র ওপর—স্বস্তি যেটুকু ছিলো—[সভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে] আমি মিছে বলছিনে। বাজে ভয় দেখাচ্ছি না তোমায়। সত্যি, আমার যেন কেমন লাগ্‌ছে! গা ছম্‌ছম্ করছে ক'দিন থেকেই—কেন, কি জানি! [শিউরে উঠে সার্ হরিশরণকে চেপে ধরেন] ওগো—ঐ গো! ওখানে কী ও? কে ও? ঐ আব্‌জানো দরজার আড়ালে কে যেন উঁকি মারলো দেখলাম!

সার্। আয়নায় নিজের চাউনি দেখেছো! আর কিছু নয়।

রাণী। কালোপানা—হাঁড়িপানা মুখ। আয়নায় কেন, দরজার আড়ালে দেখা গেল, স্পষ্ট দেখলাম। আমার মুখ বুঝি কালোপানা —হাঁড়িপানা?

সার্। না, তা' ঠিক নয়। তবে অবিকল পেত্নীর মতো তা' সত্যি।

রাণী। কার ছায়া যেন দাঁড়িয়ে—দরজার ফাঁকটায়! তাকিয়ে ত্যাখো না।

[সার্ হরিশরণ তাকালেন। আধ-ভেজানো দরজাটা দড়াম্ ক'রে খুলে যায় হঠাৎ]

সার্। ও বাবা! এ আবার কী? [চম্‌কে ওঠেন হরিশরণ]

রাণী। ছায়ামূর্তির মতন কী যেন ভেসে গেল না—? দরজার পাশ দিয়ে? সিঁড়ির দিকটাতেই গেল না যেন?

সার্। চোখের ভ্রম! ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। চোখ রগড়াও গিন্নী! অবশ্যি, এমন সময়ে চোখের এই রগড় ভালো লাগে না, তা' ঠিক।

রাণী। রসিকতা রাখো! দরজাটা অমন ক'রে খুলে গেল যে! তা'ও কি আমার চোখের ভ্রম?

সার্। হাওয়া দিয়েছে কিনা। ঝড় উঠেছে মনে হয়। তাই—

রাণী। কোথায় ঝড়! তা'হলে—[খোলা দরজাটার দিকে চাউনি আর আঙ্গুল চালিয়ে] ঐ অশথ্থগাছটা ফুলতো না? ডালপালা নড়তো না ওর? সড়সড় করতো না পাতারা?

সার্। তবে—তবে কি হারাণই এসে উৎপাত করছে? দাঁড়াও, তাড়াচ্ছি ব্যাটাকে এখান থেকে! সেই তোমাদের তেমাথার বেলগাছে পাচার করে দিচ্ছি, দাঁড়াও!

রাণী। কেবল মুখে বাহাদুরী! বেলগাছের তলায় তোমার আর যেতে হয় না। সে মুরোদ নেই! দেখেছিলে তুমি তা'র তলায়?

সার্। দেখেছি বই কি! সে-দিন হাওয়া খেতে একটু বেরিয়েই দেখলুম। পরতা কতকগুলো লোক এসে আস্তানা গেড়েছে। উদ্বাস্তু না কী যেন বলছিলো!

[নেপথ্যের বিচিত্র একটা শব্দে দু'জনেই আঁত্কে উঠলেন]

রাণী। শুনতে পাচ্ছো ঘটর্ ঘটর্? কিসের শব্দ ও?

সার্। হ্যাঁ, শুনেছি। শুনেছি এক্ষর। কিন্তু শুধু শব্দই তো নয়, গন্ধও আসছে নাকে! গন্ধটা ভুর্ভুর্ করছে হাওয়ায়। এমন গন্ধ তো এ-বাড়িতে এত বছরের মধ্যে একদিনও পাইনি!

রাণী। না না না—এ অসহ্য! এমন ধারা আমি সইতে পারি না। পারবো না। তুমি অমন চুপ্ ক'রে বসে থেকো না। যা' হয় একটা বিহিত করো এর।

সার্। চলো তো দেখিগে। [সদ্যোন্মুক্ত দ্বার ভেদ ক'রে দু'জনে এগোন—বারান্দা ধ'রে এগিয়ে সিঁড়ির ধারে গিয়ে দাঁড়ান। রেলিং-এর গা ঘেঁষে উঁকি মারেন নীচের তলায়।]

রাণী। [আঙ্গুল বাড়িয়ে] ঐ—কী ও? ও-সব কী?

হরিশরণ। তাই তো! ভারী অদ্ভুত তো! মাঝের হলঘরে দেখছি পাতা পড়েছে সারি সারি! তোলা উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে হাত চালাচ্ছে কে? হাঁড়িতে খিচুড়ি চাপিয়েছে মনে হয়। তাই তো, কী ব্যাপার এ-সব?

রাণী। বলছি না তখন থেকে আমি তোমায়? দেখলে তো এখন? সাড়া পাচ্ছি কখন থেকে! আর তুমি তো কানেই তুলছিলে না কথাটা। এখন, এখন কী?

সার্। কি রকম বড় বড় মাছের চাকা দেখছো? ইলিশ মাছ মনে হচ্ছে! খিচুড়ি আর তাজা ইলিশ মাছ-ভাজা! আহা—!

রাণী। তুমি কি এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে সিঁড়ি ধ'রে সঙের মতন? ইলিশ মাছের চাকা দেখবে আর খিচুড়ির গন্ধ শুঁক্‌বে হাঁ ক'রে?

সার্। না না, তা' কেন! দেখছি ভেবে কী করা যায়!—তুমি ঠিকই বলেছো গিন্নী! বাড়িতে উপদ্রব সুরু হয়েছে—সত্যিই! হারাণখুড়ো নয়—এরা যে জলজ্যান্ত তা'তে আর কোনো ভুল নেই—

রাণী। তা'হলে—তবে কি—কিছুই কি করবার নেই আমাদের—এর কি কোনো প্রতিকার হ'বে না—?

সার্। আল্‌বৎ হ'বে। এক্ষুনি আমি তাড়াচ্ছি ওদের এখান থেকে। দাঁড়াও আগে নিজমূর্তি ধরি। মাথাটা খুলে হাতে নিই নিজের। পালাতে পথ পাবে না যাদুরা। ছাখো না দাঁড়িয়ে!

[হরিশরণ নিজের মাথা স্কন্ধচ্যুত ক'রে স্বহস্তে ধ'রে কবন্ধরূপ ধারণ করেন]

রাণী। মাইরী, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়! এমন না হ'লে শোভা পায়? কী চমৎকার মানিয়েছে—কী বলবো!

সার্। তুমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না গিন্নী। তোমার

হাত দু'টো যারপরনাই লম্বা ক'রে বাড়িয়ে দাও। দিয়ে আমার পিছু পিছু এসো।

[সার্ হরিশরণ নিজের মাথা হাতে নিয়ে সিঁড়ি ধ'রে এগোন। রাণী বিলাসমণিও হাত দু'টো বাঁশের মতন বিলম্বিত ক'রে পিছু নেন। সিঁড়ি ধ'রে নামেন তাঁরা। একটু পরেই নীচের থেকে সোরগোল শোনা যায়। সার্ হরিশরণ ছুটতে ছুটতে উপরে আসেন, রাণী বিলাসমণিও।]

সার্। গিন্নী, সর্বনাশ হয়েছে। সেই—সেই উদ্বাস্তুরা! বেলগাছের তলা ছেড়ে হানা দিয়েছে আমাদের বাড়ি!

রাণী। [ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে] কী—কী হ'বে তা' হলে এখন—?

সার্। তাড়াবে আমাদের এখান থেকে। পালাতে হ'বে এই ভিটে ছেড়ে। তেমাথার সেই বেলগাছেই আশ্রয় নিতে হ'বে দেখছি! যদি তা'র ডালেও উঠে বাসা না বেঁধে থাকে হাঘরেরা। ঐ—ঐ গো গিন্নী! তাড়া করে আসছে লোকটা। হাতাহাতি করতেই আসছে নিশ্চয়। পালাও গিন্নী! দেরী করো না আর। পালাও!

[খোলা জানালার পথে অশত্থগাছের ডাল ধ'রে দু'জনে উধাও। সঙ্গে সঙ্গে হাতা হাতে এক উদ্বাস্তুর প্রবেশ।]

উদ্বাস্তু। তবে রে হালা মাম্দোর পুত! হানাবাড়িতে ভয় দেখাইবারে লাগ্ছো? ব্যাটা কন্ধকাটা! মাথা তো খোয়াইছোই; দাঁড়া হালা, তোর ভুঁড়ি আমি ফাসামু! বলে, হালা, আমরা মোছলাগো ডরাইলাম না, চইলা আইলাম দ্যাশ্ ছাইড়্যা। এখন কিনা ডরামু তোমাগো? আবাগের ব্যাটা ভূত! ভূতের মাসি পেত্নী! দ্যাখ্, তোগো কী হাল করি! দ্যাখ্!

যবনিকা